# তিতলীর ভালোবাসা দিবস

- তিতলী

আমি তিতলী। বান্দরবান শহরে আমার জন্ম। পাহাড়ি পরিবেশে ছোটবেলা থেকে ভালো-মন্দ, এক রকম জগাখিচুড়ির মধ্যে বড় হয়েছি। তবে আমিও খুব একটা শান্ত, ভালো মেয়ে ছিলাম না। খুব দুষ্টামি করতাম। স্কুলে বান্ধবীদের সঙ্গে মারামারি করতাম। একজনকে মেরে দৌড়ে গিয়ে টিচারস কমনরুমের সামনে দাড়িয়ে থাকতাম যেন কেউ এসে এর প্রতিশোধ নিতে না পারে। তারপর এসেমব্লির ঘণ্টা বাজলে লাইনে গিয়ে দাড়াতাম এবং এসেমব্লি শেষে ক্লাস টিচারের সঙ্গে ক্লাসে ঢুকতাম।

আবার গরমের দিনে প্রায়ই এসেমব্লিতে দাড়িয়ে ফিট হয়ে যাওয়ার অভিনয় করতাম। এই কাজটি ছিল আমাদের জন্য খুব ভয়ের। কারণ ধরা পড়লে কারও রক্ষা নেই। ধরা অবশ্য কখনো পড়িনি। পড়ালেখায় খুব একটা ভালো ছিলাম না। তবে কোনো সময় ফেলও করতাম না।

এই ছিল আমার স্কুল জীবন। খুব সংক্ষিপ্ত করে বললাম। বলতে গেলে অনেক কথা বলা হতো এবং একটা বই রচনা করা যেতো। কিন্তু একটা বই রচনা করার মতো শব্দ-জ্ঞান বা যোগ্যতা আমার নেই। আমার আরেকটা বাজে অভ্যাস ছিল শুধু বই পড়তাম। যখন যে বই পেতাম, অমনি রাত নেই, দিন, নেই খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে ওই বইটা নিয়ে পড়তাম। এর জন্য অনেকবার বাসায় মারও খেয়েছি তবে অভ্যাসটা ফেলতে পারিনি।

স্কুল থেকে কলেজ জীবনে পা রাখলাম। বড় কোনো কলেজে পড়ার ইচ্ছে ছিল বাড়ির ছোট মেয়ে বলে নিজের শহরের বাইরে পাঠাতে বাসার কেউ রাজি হয়নি। আমার মফস্বল শহরের কলেজ জীবনও খারাপ কাটেনি। কারণ, সব পরিবেশে মানিয়ে নেয়ার মতো ক্ষমতা আমার ছিল।

সব দিক থেকে একটু একটু যোগ্যতা থাকলেও কাউকে ভালোবাসি কথাটা ঠিকমতো প্রকাশ করার মতো যোগ্যতা আমার ছিল না। মনে মনে একটা ধারণা আমার প্রবল ছিল, আছে, আমি সুন্দরী না। তাই সুন্দর কোনো ব্যক্তির প্রেমে পড়লে তাকে তা কখনো জানানো প্রয়োজন বোধ করিনি। ভয় হয় পাছে সে আমাকে না করে দিলে। কেননা আমি তো সুন্দরী না।

এই জীবনে আর কিছু আবিষ্কার করতে না পারলেও একটা ব্যাপার ভীষণ ভালোভাবে বুঝেছি যে, কাউকে ভালোবাসতে গেলে নিজের মনের সৌন্দর্যের পরিচয় দিতে হয়। এবং কারো ভালোবাসা পেতে হলে বাইরের চেহারার সৌন্দর্যের পরিচয় দিতে হয়। দুটোর একটা আমার কাছে থাকলেও অপরটা আমার নেই। তাই কাউকে আমার ভালোবাসার কথা বলা হয়নি। আমিও যে কাউকে ভালোবাসতে পারি, আমার ভালোবাসাও যে, লাইলী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, রোমিও-জুলিয়েট এদের ভালোবাসার চেয়ে কম নয় তা কখনো কাউকে মুখ খুলে আমার বলা হয়নি।

জীবনের বিশটি বসন্ত কাটিয়ে দিলাম লোকের বিভিন্ন সমালোচনা, নোংরা-পঙ্কিলতা ডিঙিয়ে, হেসে-খেলে, মজা করে, আড্ডা মেরে এবং অন্যের প্রেমে জীবন মরণ সাহায্য করে। জটিলতা আমাকে তখনো পেয়ে বসেনি। সব কিছু সহজভাবে নেয়া আমার জন্য কখনো কষ্টের মনে হয়নি। আমার আশপাশের সবাইকে মনে করতাম, করি, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো মানুষ, শুদ্ধতম মানুষ, পবিত্রতম মানুষ। তারপর... আমারও এক সময় ভুল হয়ে গেল।

আমার এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের বাসায় ২০০১ সালের জুলাই মাসের দিকে এক ভাইয়া বেড়াতে এলেন। তাকে হঠাৎ করে প্রথম দেখাতেই আমার এত্ত ভালো লেগে গেল যে, আমার প্রেম এক লাফে ভালোবাসার পর্যায়ে পৌছে গেল। এখানে আরেকটা কথা বলে রাখছি, আমি প্রেম ও ভালোবাসাকে কখনো এক ভাবি না। কারণ, আমি মনে করি, প্রেম হলো ঠুনকো ভালো লাগা। হাটতে ও চলতে কতো রকমের

সুন্দরের প্রেমে পড়ে যাই আমরা। এটা এক প্রকার গড গিফটেড ব্যাপার। এর ওপর আমাদের কোনো হাত নেই। গড চাইলে যখন ইচ্ছে আমাদের এটা দিতে পারেন আবার তুলেও নিতে পারেন।

কিন্তু ভালোবাসা হলো এমন একটা বিষয় যা হঠাৎ করে কারোও মধ্যে হয় না। অনেক অনেক প্রেম, আবেগ, অনুভূতি, ভালোলাগা, শ্রদ্ধা, মায়া, মমতা সব কিছুর মিশ্রণে পাহাড় সমান যে বিষয়টি দাড়ায় তাকেই বলে *ভালোবাসা, ভালোবাসা এবং ভালোবাসা।*

যা বলছিলাম। ওই অপরিচিত ভাইয়ার প্রতি এমনই এক ভালোবাসায় পড়লাম। কিন্তু ওই যে বললাম, মুখ ফুটে কাউকে বলার মতো সাহস আমার ছিল না। তাই আবার দুই কদম পিছিয়ে পড়লাম। তবে হঠাৎ করে এর দশ কি পনেরো দিন পরেই তার একটা চিঠি পেলাম। চিঠিতে লেখা ছিল : *তার আমাকে ভীষণ ভালো লেগেছে এবং তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান।*

আমার কি সাধ্য আছে তাকে না বলার?

আচ্ছা, তার নাম এখনো বলা হয়নি। তার নাম *সকাল*। সকালের সঙ্গে আমার বন্ধুতা এক বছর চললো। তাকে আর বলা হলো না আমি তাকে ভালোবাসি। সাহস তখনো জোগাড় করতে পারিনি। এর মধ্যে তার সঙ্গে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। সামনে থাকলে আমি আর কিছুই বলতে পারি না। শুধু তাকিয়ে থাকি। চোখের ভাষা বোঝার মতো ক্ষমতা তার থাকলে তিনি আমাকে অনেক আগেই পড়ে ফেলতে পারতেন। শুধু মুখ ফুটে তাকে কখনো বলা হয়নি আমি তাকে ভালোবাসি, ভীষণভাবে ভালোবাসি।

মনের অবস্থা দিন দিন কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলছিল। একদিন সহ্য করতে না পেরে আমার এক বন্ধুর দ্বারস্থ হলাম।

বন্ধুটি আমার কথায় ভীষণ খুশি, পারলে সে তক্ষুণি ছুটে যায় সকালকে আমার কথা বলার জন্য।

তারপর এক শুক্রবারে বন্ধুটি আমাকে জোর করে একটি নীল ড্রেস পরালো, সাজিয়ে দিল সুন্দর করে। অতঃপর একটা রেস্টুরেন্টে বসা হলো আমাদের তিনজনের।

বন্ধুটি আমাকে দূরে বসিয়ে রেখে আমার ভালোবাসার কথাটি পাড়লো সকালের সঙ্গে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সেও নাকি আমাকে সেই প্রথম দিন থেকে পছন্দ করে।

সকালের সঙ্গে আমার বন্ধুর যা কথা হলো, তাকে কি বলা হলো, আমি এর বিন্দু-বিসর্গ জানি না। আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বন্ধুটি সকালকে বলেছে।

ও আচ্ছা। আমার বন্ধুকে *ধ্রুবতারা* নামে ডাকতাম। সেদিন ধ্রুবতারা আর আমি বেশ আনন্দেই বাড়ি ফিরেছিলাম। বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই ঠাট্টা-মশকারা করে বলতাম, দেখিস, ২০০৩-এর ভালোবাসা দিবসে আমি আর একা থাকবো না।

আমাদের বান্দরবানের সাঙ্গু নদীতে নৌকা ভ্রমণে যাওয়া খুবই মজার। একে তো পাহাড়ি নদী, তার মধ্যে দুপাশে উচু উচু পাহাড় পাহাড়। তাই ১৪ ফেব্রুয়ারি আমরা একটা নৌকা ভ্রমণেরও আয়োজন করলাম। প্রকৃতির সবুজকে সামনে রেখে আমার ভালোবাসার কথা নিজ মুখে প্রথমবার তাকে বলবো।

কিন্তু, আমি তো তিতলী, আমার কপাল কি কখনো ভালো হতে পারে?

এরই মধ্যে শুরু হলো যতোসব ঝামেলা। সকালের পারিবারিক অনেক অনেক সমস্যা। সে দেশে থাকবে না। তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে। সে যাবে না এ কথা বলার মতো কোনো উপায় নেই তার পরিবারে। এবং সে যদি একবার দেশের বাইরে যায় তাহলে সে আর কখনো দেশে ফিরবে না। ফিরলেও তা নয় দশ বছর পর। ভীষণ একরোখা স্বভাবের। এ কথাও সে আমাকে নিজের মুখে বললো না। বললো শুধু ধ্রুবতারাকে।

আমিও ধ্রুবতারার মাধ্যমে বললাম, আমি অপেক্ষা করবো।

সে বারবার বললো, এ ভুল যেন আমি কখনো না করি।

আমি ঠিক কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। আমার সমস্ত আনন্দ–খুশি ধুলায় মিশে গেল। কখনো জিততে পারলাম না। সব কিছুতে নিজেকে অপাংতেয় ভাবতে শুরু করলাম। আত্মবিশ্বাসের ছিটেফোটাও রইলো না আমার।

অবশেষে অনেক ভাঙা গড়ার মধ্যদিয়ে ফেব্রুয়ারি মাস এলো। প্রতিটা দিন প্রার্থনা করতে শুরু করলাম যেন সকালের বিদেশে যাওয়াটা ১৪ ফেব্রুয়ারির পরে হয়। কপালে যাই থাকুক, সকালকে সরাসরি আমার ভালোবাসার কথা বলবো।

৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টায় আমার অফিসে ফোন এলো সকালের।

আমি ভীষণ আনন্দে জিজ্ঞাসা করলাম কেমন আছো?

সে বললো ভালো নেই বন্ধু... আমি আজ দুপুর একটার ফ্লাইটে চলে যাচ্ছি।

বিশ্বাস করলাম না। বললাম, ফাজলামো করবে না।

সে বললো, না। আমি সত্যি কথাই বলছি, তুমি আগে জানলে আমাকে বিদায় জানাতে আসবে আর আমি দুর্বল হয়ে পড়তাম। তাই তোমাকে আগে জানাইনি। তোমাকে খুব ভালোবাসি তিতলী। তুমি হয়তো জানো না আমার চেয়ে বেশি তোমাকে ভালোবাসি। আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে পবিত্রতম নারী তুমি। বিশ্বাস করো, তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে এজন্য আমি দিনের পর দিন খুব কেদেছি। শুধু তোমাকে মুখ ফুটে কিচ্ছু বলিনি।

তখন আমি আর আমাতে ছিলাম না। কষ্টে–যন্ত্রণায় অফিসে সবার সামনে আমার চোখের জল ধরে রাখতে পারলাম না। রিসিভারের এপাশ থেকে কান্না ছাড়া বিদায়ের দিনে তাকে কোনো কথাই বলতে পারলাম না। আমার কান্নার তোড়ে ওপাশ থেকে সকালও নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না।

এই ছিল আমার প্রেম–ভালোবাসার কাহিনী।

সে বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি নৌকা ভ্রমণ আমাদের হয়েছিল। সবাই ছিল, শুধু সকাল ছিল অনেক দূরে। সকালকে আমার না বলা কথাগুলো বলা হলো না। কখনো বলতে পারবো কি না তাও জানি না। আর সকালের জন্য অপেক্ষা? জানি না, আমি একটা ফেল করা মেয়ে, দুর্বল মেয়ে, জীবনে সাহসিকতা যখনই দেখাতে গিয়েছি, শুধু হেরে গিয়েছি। এ জন্যই আমার ভেতরের সকল ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষাকে গলা টিপে হত্যা করেছি।

স্বপ্ন দেখতে খুব পছন্দ করতাম। প্রায়ই রাতে ঘুমুনোর আগে সাজগোজ করতাম, হাত ভর্তি চুড়ি পরে ঘুমাতাম। কেউ হাতে চুড়ি, কপালে টিপ, ঠোটে লিপস্টিক দিয়ে ঘুমাতে পারে কি না জানি না। তবে আমি ঘুমাতাম। কারণ, আমাকে স্বপ্নে সুন্দর লাগতে হবে না?

পাগলামিগুলো ছেড়ে দিয়েছি। এখন আমার কোনো স্বপ্ন নেই। ১৪ ফেব্রুয়ারি নিয়ে কোনো আশা নেই। ভালোবাসা সবাই পায় না। আমার ভালোবাসা পূর্ণতা পায়নি।

আমার একটাই সান্ত্বনা রইলো যে, আমি পৃথিবীতে একজনকে ভালোবাসতে পেরেছি, আমার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে ভালোবেসেছি। প্রকৃতি তার নিয়মে ভাঙা গড়ার খেলা খেলেছে। আমি ঠকিনি। কিন্তু সকাল ঠকে গেল। আমার ভালোবাসা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে সে ঠকে গেল।

*বান্দরবান থেকে*

## ধিক

ভালোবাসা দিবসে তো সবাই তাদের নিজেদের ভালোবাসার কথা লেখে। কিন্তু আমার তো ভালোবাসার কোনো কাহিনী নেই। কারণ, ভালোবাসার যে করুণ পরিণতি নিজের চোখ দেখেছি, তারপর কোনো ছেলেকে ভালোবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমরা কৃশ্চিয়ান। দুই বোনের মধ্যে আমি ছোট। আমার বড়আপু অত্যন্ত সুন্দরী এবং মেধাবী ছাত্রী। তিনি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজিতে অনার্স পড়তেন। শখের বশেই চাকরি নেন একটি দোকানের সেলস গার্ল হিসেবে। সঙ্গত কারণেই দোকানের নাম এখানে উল্লেখ করলাম না। সুন্দরী আপুকে দেখতে অনেক ছেলেই দোকানে আসতো।

আর এভাবেই একদিন এলো মুন্নাভাইয়া। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের স্থানীয় ছেলে। প্রতিদিন দোকানে আসা–যাওয়ার ফলে আপুর সঙ্গে তার পরিচয় হলো এবং তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠলো। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। আমাদের পরিবারে জানাজানি হওয়ার পর বাবা প্রচণ্ড আপত্তি করলেন। কারণ তার সঙ্গে আমাদের ধর্মের পার্থক্য ছিল এবং আমরা রাজশাহীর স্থানীয় আর মুন্নাভাইয়া চট্টগ্রামের ছেলে।

কিন্তু সব আপত্তি উপেক্ষা করে আপু আর মুন্নাভাইয়া বিয়ে করে ফেললেন। বাবা মায়ের বড় সন্তান হওয়ায় বাবা–মা তাদের মেনে নিলেন। আমারও মুন্নাভাইয়াকে খুব পছন্দ হলো। অমায়িক ব্যবহার, সুন্দর কথাবার্তা। সব দিক থেকেই তাকে পরে সবারই পছন্দ হয়েছিল।

এর মধ্যে আপু পাস করে একটা সরকারি চাকরি পেয়ে যান রাজশাহীতেই। তাই তারা এখানেই থাকতো।

দুই তিন বছর পর মুন্নাভাইয়া বাড়ি গিয়ে বেশ কয়েকদিন হওয়ার পরও যখন আর আসছিলেন না তখন খোজ নিয়ে জানা গেল তিনি নাকি ওখানে আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন।

এই খবর শুনে আপা ছুটে গেলেন তাদের বাড়িতে। কিন্তু তখন আমরা জানতাম না যে, আমার আপু আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না। সেখানে কি হয়েছিল জানি না। এর পাচ ছয় দিন পর কফিনে করে আপুর লাশ এসেছিল আমাদের বাসায়।

আপুকে বিষ খাইয়ে মেরে কফিনে করে পাঠিয়ে দিয়েছিল তারই ভালোবাসার মানুষ মুন্না।

আমরা কিছুই করতে পারিনি। প্রথমত আমাদের ভাই নেই এবং দ্বিতীয়ত, মুন্না ছিল চট্টগ্রামের স্থানীয় ছেলে। রাজশাহী থেকে ওখানে গিয়ে আমাদের পক্ষে কিছুই করার ছিল না।

আপুর জন্য আমরা কিছুই করতে পারিনি। শুধু পারি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে। পারি মনে মনে ধিক্কার দিতে সেই সব মুন্নাদেরকে যারা আমার আপুর মতো সরল মেয়েদের নিয়ে ভালোবাসার খেলা খেলে। ধিক, সেই সব পুরুষকে। ধিক, তাদের ভালোবাসাকে।

*নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

## দুইটা চাবি

একজনকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। তাকে আমার জীবনে চাই। তার প্রতি আমার যে ভালোবাসা সেটা স্বর্গীয়, পবিত্র ভালোবাসা। আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে চাই। কিন্তু জানি, আমার জীবনে তাকে পাওয়ার আশা খুব কম। কারণ, তারা বড়লোক, শুনেছি বড়লোকেরা হিংসুটে হয়। এছাড়া সে আমার ছোট খালার মেয়ে। ছোট খালাকে পুলিশের মতো ভয় পাই। তবে তাকে পাবো এজন্য আশা করতে পারি যে, সে অতি মিশুক।

একবার কোনো এক কাজে তাদের বাসায় দুই তিন মাস ছিলাম। তারা থাকতো ঢাকার শেওড়াপাড়ায়। তখন তার বয়স হবে বারো কি তেরো বছর। সবেমাত্র বুকের দুই পাশের কাপড় ঠেলে দুটো স্তন উচু হতে লাগলো। দুপুরে খাবার খাওয়ার পর তার মাসহ আমরা এক সঙ্গে শুতাম। কোনোদিন যদি খালা আমাদের আগে ঘুমিয়ে যেতেন, আমরা একে অপরের হাত নিয়ে বিভিন্ন রকমের দুষ্টুমি খেলা করতাম। পায়ের সঙ্গে পা লাগিয়ে রাখতাম।

একদিন সে আমাকে বললো, পুপুল, পতুল বই পতুল–এর মানে কি জানেন?

আমি বলি, না।

সে বললো, *ঢল ঢল, বুক ঢল*। আবার বললো, আমাকে দুইটা চাবি দাও ইংরেজিতে বলেন।

আমি বললাম, পারি না।

সে বললো গিভ মি টু কিসেস। সে বললো, গিভ মি টু কিসেস-এর আরেকটি অর্থ হলো, *আমাকে দুটি চুমু দাও।*

তার একটা জামার গলা বড় ছিল। যখন ওই জামাটা পরতো তখন মাঝে মধ্যে তার বুকের পাহাড়ি অঞ্চলের বেশ কিছু অংশ দেখা যেতো। প্রায় সময় তাকে বুকের কাপড় ঠিক করার জন্য ইশারা করতাম। সে সঙ্গে সঙ্গে মুচকি হেসে ঠিক করে নিতো।

চাবির ইংরেজি Keys - Kiss নয়। কিন্তু তাতে কি? সে ইচ্ছা করেই অবুঝ হয়েছিল।

আমিও।

*নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে*

# জটিল বিষয়

– আনিস

ভালোবাসার মতো এতো জটিল বিষয় পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ। অন্যান্য বিষয় নিয়ে দিব্যি দুই কলম লিখে ফেলা যায়। কিন্তু ভালোবাসা বিষয়ে লেখা ভীষণ কঠিন। ভালোবাসা যেমন ঝুকিপূর্ণ কাজ তেমনি এ নিয়ে লেখাও ঝামেলাপূর্ণ। কবিগুরু থেকে শুরু করে হালের আধুনিক কবিটির আজও বোঝা হলো না ভালোবাসা আসলে কি?

ভালোবাসার কথা এলেই আমাদের মনে হয় যে, ভালোবাসা কেবলই নর-নারীর বিষয়। অর্থাৎ নর-নারীর মধ্যেই ভালোবাসা সীমাবদ্ধ। সত্যিই কি তাই? একজন মানুষের জীবনে নানান দিক থাকে। যেমন তার শৈশব কৈশোর, শিক্ষা, জীবন, কর্মজীবন, শখ, দর্শন প্রভৃতি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ওতপ্রোতোভাবে ভালোবাসা জড়িয়ে থাকে। তাই মানব জীবনে নানান ধরনের ভালোবাসা লক্ষণীয়। তবে মানব-মানবীর ভালোবাসা হলো শ্রেষ্ঠতম ও চিরন্তন। যদিও সেখানেও থাকে অনেক ফাক-ফোকর।

ভালোবাসা কি না জানি না। ভালো লেগেছিল আমার গৃহশিক্ষক মফিজস্যারকে। স্যারের বাড়ি সম্ভবত লক্ষ্মীপুর। একবার সিগারেট খাওয়ার অপরাধে তিনি যে শাস্তি আমাকে দিয়েছিলেন তা ভোলার নয়। স্যার আমাকে তিন বছর পড়িয়েছেন। তারপর আর দেখা হয়নি।

একটা কিন্ডার গার্টেন-এ কিছুদিন পড়িয়েছিলাম। সেখানে মাঝে মধ্যে স্যারের দেয়া শাস্তিটা প্রয়োগ করতাম। তখনো স্যারের কথা মনে পড়তো, এখনো পড়ে।

আমার কৈশোরের ভালোবাসার নাম *খেলাধুলা।* বাবার সাইকেলের পেছনে বসে খেলা দেখতে যাওয়া ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সুখ। তখন থেকেই ফুটবল খেলাটিকে ভালোবেসে ফেলি। সালাম, বাদল রায় আর সাব্বির ছিল আমার ভালোবাসার খেলোয়াড়। অন্যদিকে প্লাটিনি, রুমেনিগে, জিকো এবং ম্যারাডোনা আমার ভালোবাসাকে পৌছে দিয়েছিল আকাশের উচ্চতায়। ব্রাজিল এখনো আমার গভীর ভালোবাসায় সিক্ত।

দেশের ফুটবল কর্তাদের অদূরদর্শিতা, মূর্খতা আর ব্যর্থতা ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা অনেকটাই কেড়ে নিয়েছে। ফুটবল এখন শুকনো নালা। কৃকেট যেন দুকূল উপচানো নদী। আমিও গত যৌবনা ফুটবলকে বাদ দিয়ে যৌবনবতী কৃকেটের ভালোবাসায় মত্ত। সে ভালোবাসা অনেক গভীর। তা না হলে পাকিস্তানের মুলতান-

এ ইনজামাম যখন আমাদের প্রথম টেস্ট বিজয়টাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তখন কেন টয়লেটে গিয়ে গোপনে অশ্রু বিসর্জন দেবো!

ভালোবেসেছিলাম বঙ্গবন্ধু, শহীদ জিয়া আর *ধানের শীষ* মার্কাটিকে। সে ভালোবাসা টিকে ছিল সেদিন পর্যন্ত। কিন্তু গত দু বছরে ঘোর কেটে গেছে। নিজে শিক্ষিত হয়েও বেকার থাকা, ভয়াবহ সামাজিক সন্ত্রাস, দ্রব্যমূল্যের উল্কার মতো ঊর্ধ্বগতি, বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাস, সহ্যের সীমানা ছাড়ানো ট্রাফিক জ্যাম, দুর্নীতিতে হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন প্রভৃতি বিষয় আমার ভালোবাসাকে নিঃশেষ করেছে। নৌকায় চড়েও শেষ রক্ষা হয়নি, ডুবতে হয়েছিল। ধানের শীষও পেট ভরাতে পারলো না। ডুবন্ত অবস্থায়, খালি পেটে কি ভালোবাসা হয়?

লেখাপড়াকে ভালো না বাসলেও বইকে ভালোবেসেছি সব সময়। এর প্রতি আমার তীব্র অনুরাগ। ছোটবেলায় চাচা-চাচির সঙ্গে মার্কেটে গিয়ে নাকি ফুটপাথের বইয়ের দোকানের পাশে বসে পড়েছিলাম। অবশেষে বই কিনে দেয়ার পর উঠি। অথচ তখন না কি পড়তেই পারতাম না।

প্রচুর বই পড়লেও সিরিয়াস বা বিখ্যাত বই প্রায় পড়াই হয়নি। বারো বছর বয়সে পড়া শুরু করেছিলাম শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত*। শেষ করতে পারিনি। সে ভালোবাসা এখন আর অবশিষ্ট নেই। ভালোবেসেছি *মাসুদ রানা*-কে যার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কটা আজও অটুট। আরো ভালো লেগেছিল *বড়দের আরব্য রজনী,* হেনরী মিলারের ট্রিলজি *সেক্সাস, নেক্সাস, প্লেক্সাস।*

এরপর হুমায়ূন আহমেদ কেড়ে নিলেন অসংখ্য রাতের ঘুম। *থ্রি কমরেডস, গডফাদার, দি প্রিজনার অফ জেনডা, থ্রি মাস্কেটিয়ারস, ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক* প্রভৃতি বই ছিল আমার কাছে প্রেমিকার চেয়েও আকর্ষণীয়। আশ্চর্য হলেও যে বইটি পড়ে কেদেছি সেটির নাম *রবিনহুড।* অজান্তেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম *গডফাদার* বই-এর একটি চরিত্র - উচ্ছল তরুণী *অ্যাপোলোনিয়া*-কে। তবে ভালোবাসাকে যে বইটি মহান করেছে তার নাম *এ টেল অফ টু সিটিজ।*

প্রেম প্রত্যাশায় পাগল, উন্মত্ত প্রেমিকরা এ বইটি পড়তে পারেন। তাহলে ব্যর্থ হলে কিংবা প্রত্যাখ্যাত হলে প্রেমিকার মুখ এসিডে ঝলসে দেয়ার ইচ্ছে থাকবে না। সিডনি কার্টন, লুসি আর চার্লস এ তিন মহান প্রেমিক-প্রেমিকা সকল প্রেমিক-প্রেমিকার আদর্শ হয়ে উঠুন। তবে একটি কথা গোপনে জানিয়ে দিতে চাই, বিদেশি সব বই-ই পড়েছি মূল বই-এর বাংলা অনুবাদ।

সকল ভালোবাসাকে ছাপিয়ে যে ভালোবাসা তা হলো মানব-মানবীর ভালোবাসা। চিরন্তন এ ভালোবাসার মহিমা বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ ভালোবাসার জন্যই পৃথিবীটা আজও এতো সুন্দর! আজও ফুল ফোটে। আকাশটা আজও নীল। এখনো অঝোরে বৃষ্টি ঝরে। এখনো ঝরনাধারা বয়ে যায়। সৃষ্টির শুরু থেকেই এর পেছনে ছুটছে মানুষ। তবে সবাই পায় না এর খোজ। কেউ কেউ পায় কেউ বা আবার পেয়েও হারায়।

আমিও নেমেছিলাম এর অন্বেষণে। পেয়েছিলাম জীবনের শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা। মায়া-মমতা, শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস মেশানো সে ভালোবাসা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক ত্যাগের পর তা অর্জন করতে পেরেছিলাম। আমাদের ভালোবাসা দিবস দুটি। ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাড়াও আমাদের অন্য ভালোবাসা দিবসটি হলো ৬ ফেব্রুয়ারি। ৬ ফেব্রুয়ারি কোনো এক ঈদের আগে তার কাছে ভয়ে পৌছে দিয়েছিলাম ভালোবাসার বার্তা।

আমাকে অবাক ও বিস্মিত করে সে আমার আবেদন অনুমোদন করেছিল।

সে থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি আমাদের মূল ভালোবাসা দিবস।

তারপর নয়টি বছর গেলো কতো আনন্দ আর ভালোবাসায়। পবিত্র সে ভালোবাসায় কোনো কলঙ্ক ছিল না, ছিল না কোনো পাপ। এরপর একদিন ঝড় এলো। সে ঝড়ে উড়ে গেল আমার এতোদিনের স্বপ্নসৌধ। সামান্য

একটি ভুল তাকে নিয়ে গেল অনেক অনেক দূরে। ভুল, নাকি অপরাধ? নাকি দুটোই? আমি নিরন্তর সে প্রশ্নের উত্তর খুজি।

সময় বয়ে যায়। আমি অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা করি, ভুলের মাশুল দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না! কোথায় যেন পড়েছিলাম –

If you love someone, set him free.
If he returns, he's yours.
If he doesn't he never was.

কিন্তু আমার বেলায় এ কথা খাটেনি। আমি তার কাছে ফিরে গেলেও সে তো ফিরে আসেনি।

এখনো মাঝে মাধ্যে আমাদের দেখা হয়, কথা হয়। ওকে এখনো ভালোবাসি প্রাণের চেয়েও বেশি। এখনো ওকে চাই আমি। জানি ও আমাকে ভালোবাসে। হয়তো আমার চেয়েও বেশি। তারপরও আমরা যেন দুই ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। আমরা জানি, আমাদের ভালোবাসা কখনোই সফল হবে না। তারপরও ভালোবাসি। এক অদ্ভূত ভালোবাসায় বসবাস আমাদের!

এখন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছি। ফাসির আসামি যেমন মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গোনে আমিও দিন গুণছি কবে ও চকচকে বিয়ের কার্ড সদৃশ ফাসির আদেশ হাতে দিয়ে বলবে, *আমার বিয়ে, এসো কিন্তু।* জানি, তখন ওর সুন্দর চোখ দুটিতে থাকবে জল আর ঠোটে থাকবে একটা বিদ্রূপ মেশানো বাকা হাসি। আমি কিছুই বলবো না। কেবল মাটির দিকে তাকিয়ে থাকবো। চোখের জল গোপন করতে হবে যে!

ভালোবেসে ব্যর্থ হয়ে অনেকেই আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কোনো এক হিন্দি মুভিতে একটি সংলাপ শুনেছিলাম, Love is a part of life but not the heart of life. সুতরাং ভালোবেসে কেউ ব্যর্থ হলে জীবনটাকে অর্থহীন ভাবা উচিত নয়। কারণ, তাতে জীবনের একটি অংশই হয় তো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পুরো জীবন নয়। আর ভালোবাসা কখনো শেষ হয় না। যতোদিন এ পৃথিবীটা থাকবে ততোদিন ভালোবাসাও থাকবে। রঙিন ফুল, আকাশের পাখি, রূপালি চাদের জ্যোৎস্না, পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্যকে ভালোবেসেও তো আমরা বাচতে পারি। অবারিত ও নিঃস্বার্থ হোক আমাদের ভালোবাসা।

সবাইকে ভ্যালেন্টাইনস ডের শুভেচ্ছা।

*ঢাকা থেকে*

*sonar_tori@fastmail.fm*

## সুখে জর্জরিত

– রূপ'স মাম ওরফে ভূত বিড়াল

এই মুহূর্তে যাকে নিয়ে লিখতে বসেছি সে হচ্ছে আমার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, আমার সেরা বন্ধু ওরফে রূপ'স পাপা (Papa)। আজকে সকালে সে আমাকে বলেছে, সন্ধ্যার পরে তুই আমাকে ফোন করবি না। আমার বাপ বাসায় থাকে।

আমারও জেদ হয়েছে। আমি ঠিক করেছি এই লেখাটি শেষ করেই তাকে ফোন করবো। তার বাপ ধরলে বাপের সঙ্গেই প্রেমালাপ শুরু করবো।

সে আমাকে ডাকে রূপ'স মাম (Mum) বলে।

আমি তার অনেকগুলো নাম দিয়েছি। তার মধ্যে পচা, তেলাপোকা, টিকটিকি, হনুমান সিং, বিচ্ছু রোবোকপ সাহেব, মিল্কি ক্যানডি, ফিডার বাবু উল্লেখযোগ্য। এই নামগুলো রাখার পেছনে একশ দশটা কারণ আছে।

সেগুলো লিখতে গেলে আমার কলমের কালিই শেষ হয়ে যাবে। এবার শুরু করা যাক তার কীর্তিকলাপের কাহিনী।

সে আমাকে প্রায়ই বলে, জান, আমাদের কয়টা বাবু হবে। আমাদের বাবু দেখতে খুব সুন্দর হবে, ফর্শা, নরম, তুলতুলে হবে ইত্যাদি।

যাদের উদ্দেশ্যে লেখা তারা বুঝতেই পারছেন কি রকম বিচ্ছু শয়তান আমার সোনাটা। এ লেখাটা যদি প্রকাশিত হয় সে আমাকে বলবে, এগুলো কি লিখেছিস পচা মেয়ে। আমার মানসম্মান সব ডুবিয়েছিস।

আরও আছে। তার সামনে এলে, তাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলে সে এমন ভাব করে যে, মনে হবে আমি তার ক্লাসমেট কাম বন্ধু ছাড়া আর কিছুই না। অথচ টেলিফোনে যখন কথা বলবে তখন টেলিফোনে পাপি দিতে দিতে টেলিফোনের সব ময়লা খেয়ে ফেলে। তার যতো প্রেম সব ফোনে।

সেদিন ফোন করলাম।

বললো, ডিস্টার্ব করিস না, এখন ঘুমাবো।

বললাম, ঘুমা, নিষেধ করেছি নাকি?

হনুমান সিং তখন বললো, ফোন করছিস কেন বার বার কানের কাছে।

সে নিজের রুম ছেড়ে ড্রয়িং রুমে ফোনের কাছে এসে ঘুমের অভিনয় করছে। কারণ আমি ফোন করবো তাই। অথচ সে মুখে বলবে অন্য কথা। এটা তার মহৎ একটা গুণ।

সে বহুত দিলের অধিকারী। তার মোটর সাইকেল যে যখন ধার নিতে আসে সে তখনই সেটা দিয়ে দেয়। মোটর সাইকেলের বদৌলতে ছোট-বড় মিলে তার দোস্তের সংখ্যা হাজার খানেক। এরা সব যখন-তখন মোটর সাইকেল নিয়ে হাওয়া খেতে যায়। এসব প্রাণের দোস্তরা ডেটিংয়ে যাওয়ার সময় তার মোটর সাইকেলটা নিয়ে যায়। তাহলে প্রেমিকার কাছে মুডটা ঠিক থাকে। নিজেকে তখন ঋত্বিক রোশন মনে হয়। তার মোবাইল স্ক্রনে একটা মেয়ের চোখ, কান ও ঠোট দেখা যায়।

সে বলে, এটা যদি জানের ঠোট হতো তাহলে টুক করে পাপি দিয়ে দিতাম।

শখ কতো শয়তানটার। আরো আছে, তার মোবাইলে হয়তো রিং বাজছে। দেখা যাবে মোবাইল দুই তালায়, সে চার তলায় অথবা সে বাথরুমে, মোবাইল তার বডিগার্ডের হাতে বা মোবাইল রিকশাচালকের হাতে। এবং সে রিকশা দাড় করিয়ে দোস্তের বাসায় আড্ডায়।

এখানেই শেষ নয়। আমাকে হয়তো বললো, বাসায় থাক, তোর বাসার সামনে আসছি। বুদ্ধিও শিখিয়ে দেয়, আমি মোবাইলে রিং দেবো, তখন বুঝবি এসেছি।

বারান্দায় বসে আছি তো আছি, এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা পার হয় তার খোজ নেই। শেষে গিয়ে দেখা গেল, সে চায়নিজে থাই সুপ আর নুডুলস খাচ্ছে ছোট ভাই ও রিকশাচালকের সঙ্গে।

রিকশায় করে ঘুরতে বের হয়েছি। ধানমন্ডি লেকের কাছে এসে বললো, জান, আপনার ঠোট দুটো এতো সুন্দর দেখাচ্ছে কেন, মনে করেছিলাম বিয়ে করে তারপর খাবো, এখন মনে হচ্ছে এখনই খেয়ে ফেলি। বলে, সরে বসবে!

ভাবখানা এমন যেন একটু আগে কিছুই বলেনি সে। তখন মনে হয় দুই গালে ঠাশ করে দুটো চড় মারি।

সমস্যাটা এখানেই। তাকে কিছুই বলতে পারি না। মাঝে মধ্যে কথা না শুনলে একটু বকা দিলে সেই দিন আর আমার কান্না থামতেই চায় না। এই বিচ্ছু শয়তানের অত্যাচারে আমার জীবনটা সুখের সাগরে জর্জরিত। আমাকে প্রচণ্ড জ্বালায়। তার জ্বালানোর ধরন অন্য রকম। প্রচণ্ড ভালোবাসে আমাকে। কিন্তু দুনিয়ার মানুষকে বোঝাবে সে সাধু পুরুষ, জীবনে বিয়ে করবে না। আবার আমি যদি রাগ করে তিন চার দিন কথা না বলি তাহলে তার বন্ধু সার্কল ও মোটর সাইকেলসহ হাজির হবে বাসার সামনে।

এই বাদরটাকে আমি অতিরিক্ত ভালোবাসি। ভেবেছিলাম লিখবো না কথাটা, তাহলে আবার মুড বাড়বে। এমনিতেই তার মেলা মুড।

*লালমাটিয়া, ঢাকা থেকে*

# উইল ইউ ম্যারি মি?

– মুস্তাহিদ হোসেন বাবু

আর মাত্র দুই সপ্তাহ পর গ্র্যাজুয়েশন। রুমে পড়ার টেবিলে বসে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ের সর্বশেষ প্রজেক্টের ওপর কাজ করছি এবং নিকট ভবিষ্যতের নানান অ্যাকশন প্ল্যান সম্পর্কে ভাবছি। এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। পিপহোলে দেখলাম অপর পাশে ব্রায়ান দাড়িয়ে আছে।

ব্রায়ান আমার ব্যাচমেট। আমরা একই সঙ্গে ডর্মে রেসিডেন্ট এডভাইসর বা সংক্ষেপে আরএ (RA)–র চাকরি করি। তার সঙ্গে আমার পরিচয় সফোমোর বা সেকেন্ড ইয়ার থেকে। আমি বিশ্বাস করি, ব্রায়ান–এর মতো ভালো ছেলে খুবই কম দেখেছি এবং ভবিষ্যতেও দেখতে পাবো বলে মনে হয় না।

দরজা খুলতেই ব্রায়ান থমথমে মুখ নিয়ে চুপচাপ একটা চেয়ারে এসে বসলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? আবার ইনটিমেসি ডিসঅর্ডারে ভুগছো নাকি।

কিভাবে বুঝলে? ব্রায়ান পাল্টা জিজ্ঞাসা করলো।

হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম, তোমার চোখে–মুখে *কি হবে গতি, বিশ্বপতি, শান্তি কোথায় আছে?* ভাবটা অত্যন্ত প্রবলভাবে বিদ্যমান ব্যাপারটি কি? জেমি–র সঙ্গে আবার ঝগড়া করেছো নাকি?

ব্রায়ান মাথা নাড়লো।

আমি একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

আমেরিকান ভাষায় যাকে বলে *হাই স্কুল সুইটহার্ট*। ব্রায়ানের গার্লফ্রেন্ড জেমি, তাও একেবারে হাই স্কুল পর্যায় থেকে। জেমিও আমাদের ব্যাচমেট এবং বর্তমানে আরএ হিসেবে অন্য আরেকটি ডর্মে কর্মরত। এ দুজনের মতো সুখী যুগল খুবই কম দেখেছি। একেবারে দুজন দুজনার। তবে যে কোনো কারণেই হোক না কেন, সাধারণত প্রতি দেড় দুই মাস পর পর দুজনের মধ্যে কিছু একটা নিয়ে ঝড় ওঠে যার পরিণতিতে আমার ঘরে এসে ব্রায়ান চুপচাপ বসে থাকে এবং সন্ধ্যার দিকে জেমি আমাকে সাইক্লোনের যাবতীয় খুটিনাটি জানাতে ফোন করে।

আমি শতকরা একশ ভাগ নিশ্চিত যে, আজও তার ব্যতিক্রম হবে না।

জেমি আর ব্রায়ান দুজনেই আমাকে তাদের সাইকিয়াট্রিস্ট জাতীয় কিছু একটা বলে মনে করে বোধহয়। ওদের ধারণা, ওদের কথা আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনি এবং সময় মতো চমৎকার উপদেশ দিতে পারি।

আসলে মজা এখানেই, ওরা কথা বলার সময় আমি চুপচাপ থাকি এ কথা সত্য হলেও এখন পর্যন্ত কাউকে কোনো ব্যাপারে উপদেশ দিইনি। উপদেশ দেয়ার মতো পরিণত বয়স আমার হয়নি। তারপর বিরহ এবং অনুরাগে কাতর কপোত–কপোতিনীকে তো কোনো উপদেশ দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এর কারণ, আমি বললেই যে এরা শুনবে এমন কোনো কথা নেই। এছাড়া খুব ভালো করেই জানি যে, কাল হোক বা পরশু হোক, মিয়া–বিবির ভুল বোঝাবুঝি ঠিকই ভাঙাব এবং তখন যদি কিছু বলে থাকি তাহলে দুজনে মিলে আমার কথার উল্টো মানে বের করে পরে দেখা যাবে আমাকে ফাসির আসামি বানিয়েছে। এ কারণে বের যখনই এ জাতীয় ঘটনা ঘটে তখন শুধু চুপচাপ শুনে যাই। তাছাড়া আমার মনে হয়, এরা আমার সঙ্গে কথা বলে হালকা

বোধ করে বলেই আমার কাছে আসে। আমার কোনো উপদেশ এদের প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না।

তবে আজকে আমার প্রচলিত আচরণের একটু রদবদল হলো। ল্যাপটপ কমপিউটারের সঙ্গে লাগানো হেডফোনটা খুলে স্পিকারের সাউন্ড বাড়িয়ে দিলাম। ব্রায়ানকে বললাম, গানটি আগে বাংলায় শোনো, পরে তোমাকে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

*পুরনো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়*
*ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়*

*হায় মাঝে হলো ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায় –*
*আবার দেখা হলো যদি সখা, প্রাণের মাঝে আয়*
*আয় আর একটিবার আয়রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়*
*মোরা সুখের দুঃখের কথা কবো, প্রাণ জুড়াবে তাই।*

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আমেরিকানরা হয়তো ভাঙতে জানে, মচকাতে জানে না। তবে বঙ্গসন্তানের আবেগ এবং মস্তিষ্কের কাছে যেখানে হিমালয়ের বরফ গলতে বাধ্য সেখানে একই কারণে তেইশ বছর বয়সী কোনো আমেরিকান যুবকের তার প্রথম প্রেমের নায়িকার জন্য আবেগে দুই তিন ফোটা অশ্রু ত্যাগের ঘটনা তো একেবারে মামুলি হাম জ্বর। ব্রায়ানের চোখে জল দেখে আজ একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম, মুরগি ভালো প্রেমে পড়েছে।

শুধু মজা করার জন্য ব্রায়ান–এর বললাম, আমার দেশে প্রেম ঘটিত ব্যাপারগুলো একটু ভিন্ন। এক্ষেত্রে পাত্র–পাত্রীর ভালোবাসাটা প্রকাশ করার চেয়ে *ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি, সঙ্গোপনে তোমারে সখা কতো ভালোবাসি* জাতীয় মনোভাবই বেশি করে প্রাধান্য পায়। তবে ভাই, তোমার দেশে তথা আমেরিকার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। টাকা–পয়সা আর গার্লফ্রেন্ড একবার অন্যের হাতে পড়লে কিন্তু ফেরত পাওয়া বড়ই দুষ্কর। বুঝতে হবে। তখন *আকাশের মিটিমিটি তারার সঙ্গে কথা বলা* ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। *অশ্রু দিয়ে গাথাবো মালা* জাতীয় গান তখন যতোই গাও, কোনো লাভ নেই। দেখা যাবে, তখন বিকাল চারটার সময় কাজকর্ম বাদ দিয়ে বারে বসে রয়েছো, এবং *হাইনিকেন* বিয়ারের বোতলে চুমুক দিয়ে বলছো, Man...Love is a mother-fu❋❋er! এবং বুঝতে হবে।

দুই সপ্তাহ পরের ঘটনা। আজ আমাদের গ্র্যাজুয়েশন। নিঃসন্দেহে জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্র্যাজুয়েশন কনভোকেশন হলো আমেরিকান ক্যাম্পাসগুলোর একটি অন্যতম আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। সাধারণত ইউনিভার্সিটির স্টেডিয়ামে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মূল অনুষ্ঠানের মঞ্চটি অত্যন্ত সুসজ্জিত করে সাজানো হয় এবং স্টেডিয়ামের প্রতিটি গ্যালারিতে কানায় কানায় পূর্ণ দর্শকদের দেখার সুবিধার জন্য মঞ্চের দুপাশে দুটি বিশাল আকৃতির প্রজেক্টর থাকে।

এ অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট থাকেন ডিন (Dean), চান্সেলর, ডিপার্টমেন্ট হেড–রা এবং ইউনিভার্সিটির খুব চৌকষ কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী যারা সহপাঠীদের কাছে বিগ ফিশ (Big Fish) বা রুই–কাতলা বলে অধিক পরিচিত। বাকি গ্র্যাজুয়েটিং ছাত্রছাত্রীরা মঞ্চের সামনে চেয়ারে সারিবদ্ধভাবে বসে থাকে। এরপর এক পর্যায়ে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী মঞ্চে উঠে ডিন এবং চান্সেলর–এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবার আগের জায়গায় এসে বসে।

আজ লক্ষ্য করলাম, ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে বের হওয়া এটা আমেরিকানদের জন্যও বিরাট একটা ব্যাপার। দেখলাম, বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে পাচ ছয়জনের একটা করে দল, চারদিকে শুধু ক্যামেরার শাটারের শব্দ। ছাত্রছাত্রীরাও যাতে জীবনের এই উল্লেখযোগ্য দিনটিতে বাবা–মা, বন্ধু–বান্ধবদের ধন্যবাদ জানাতে পারে সে জন্য ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ ব্যবস্থা করেছে। ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার।

একজন গ্র্যাজুয়েটিং ছাত্র বা ছাত্রী ডিন–এর সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য যখন মঞ্চে উঠতে যাবে ঠিক তখন সিড়ির গোড়ায় দণ্ডায়মান একজন অফিশিয়ালের হাতে একটি স্লিপ দেয়া হয়। বিশেষ নাম্বার যুক্ত এই স্লিপটি অনুষ্ঠানে ঢোকার আগেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে দেয়া হয়। স্লিপটি হাতে পেয়েই অফিশিয়ালটি মাউথ পিসের সাহায্যে নাম্বারটি অদূরে ল্যাপটপ কমপিউটার নিয়ে বসে থাকা একজনকে জানিয়ে দেন। এই ব্যক্তিটি নাম্বারটি শুনেই একটি করে বিশেষ স্লাইড প্রজেক্টরে দেখানোর ব্যবস্থা করেন। এ জাতীয় স্লাইডে এক–দুই লাইনের সংক্ষিপ্ত ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য লেখা থাকে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, Thanks dad for the money বা Oh...I'm finally done ইত্যাদি। সাধারণত একজন ছাত্র যখন মঞ্চে ওঠে ঠিক তখনই তার নাম এবং বক্তব্য সংবলিত স্লাইডটি প্রজেক্টরগুলোর মাধ্যমে স্টেডিয়াম ভর্তি দর্শকদের কাছে পরিবেশিত হয়।

আজ এই অনুষ্ঠানে অন্য রুই–কাতলাদের সঙ্গে মঞ্চে বসে যতোটা খুশি হবার কথা ততোটা খুশি হতে পারলাম না। বার বার মনে হতে লাগলো বিগত চার বছরের অনেকটা যাযাবর জীবন যাপনের কথা। মনে পড়লো প্রতিটি মুখ যাদের মধ্যে আছে পথের যেসব মানুষ আপন হয়েছে এবং আপনজন যারা পর হয়ে গেছে সবার কথা। এছাড়াও যুক্ত হলো গত কয়েকদিনের উত্তেজনা, ক্লান্তি। বুঝতে পারলাম, কয়েক হাজার লোকের সামনে মঞ্চে বসে থাকাটা অত্যন্ত বিরক্তিকর। ছাত্রছাত্রীদের আড্ডা, হাত মেলানো, চলে যাওয়া এই পৌনঃপুনিকতায় আমি ক্লান্ত। তবে আশার খবর হলো যে, লাইন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, লাইনের শেষে দাড়ানো ছেলেটির চেহারাও দেখা যাচ্ছে।

আরে, এ যে দেখছি ব্রায়ান। তার মানে তার সামনের মেয়েটা জেমি। ব্রায়ানকে চুপচাপ দেখালেও দেখলাম জেমি হাসছে। কর্ত্রী যখন হাসছেন তখন বুঝতে হবে ঘরের ঝামেলা মিটে গেছে। ভেরি গুড! আমি নিশ্চিন্ত হলাম।

দেখতে দেখতে জেমিও চান্সেলরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে গেল। এরপর ব্রায়ানের টার্ন। ব্রায়ান মঞ্চে উঠতেই এক সঙ্গে প্রায় পুরো স্টেডিয়াম হাততালি দিয়ে উঠলো। ভাবলাম, এতোক্ষণ একই দৃশ্য দেখতে দেখতে দর্শকরাও বুঝি ক্লান্ত হয়ে গেছে তাই শেষ ব্যক্তি হিসেবে ব্রায়ানকে মঞ্চে উঠতে দেখে বোধহয় সবাই ভাবলো, যাক বাবা, বাচা গেল। কিন্তু দুই সেকেন্ড পরেই বুঝলাম এতো সোরগোলের পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে। পাশ ফিরে প্রজেক্টরের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলাম চারদিকের হুল্লোড় আর হাজার চারেক ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইট ঝলকানির কারণ। ব্রায়ানের স্লাইডে লেখা : WILL YOU MARRY ME, JAMIE? জেমি তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?

আমেরিকানরা সারপ্রাইজ দিতে ভালোবাসে। তবে এ সারপ্রাইজটা এতোই আকস্মিক এবং মধুর যে, জেমি একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লো। বেচারি প্রথমে মঞ্চ থেকে নেমে হেটে নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ চারদিকের হই চই, হাততালি শুনে পেছন ফিরে দেখে ব্রায়ান হাটু গেড়ে বসে, বুক পকেট থেকে একটি আংটি হাতে নিয়ে জেমির দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রত্যুৎপন্নমতি এবং সব্যসাচী ক্যামেরাম্যান পুরো দৃশ্যটা প্রজেক্টরের মাধ্যমে ইতিমধ্যে প্রচার করেছেন, এবার ক্যামেরার ফোকাস এখন জেমির মুখের ওপর ধরা হলো। জেমিকে অ্যাসিসটান্ট ডিন মিস পামেলা পেরি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তোমার উত্তরটা কি?

লাজুক হাসি আর চোখে পানি, এই অবস্থায় জেমি উত্তর দিল, হ্যা, রায় হচ্ছে, হ্যা।

লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, এই নতুন যুগলকে আপনারা বড় হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করুন।

স্টেডিয়ামে উপস্থিত প্রতিটি ছাত্রছাত্রী এবং দর্শক নিজ আসন থেকে উঠে দাড়িয়ে ব্রায়ান ও জেমিকে অভিবাদন জানালো।

আমার পাশে দাড়ানো ডিপার্টমেন্ট হেড, ড. অলিভিয়া শেং হাততালি দিতে দিতে বললেন, এ রকম চমকপ্রদ দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি।

পাশে দাড়িয়ে ভাবলাম, *ভালোবেসে যদি সুখ নাহি তবে কেন মিছে ভালোবাসা?*

ভালোবাসা প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথকেও কম চিন্তা করতে হয়নি। তিনি তো বলেই গেছেন, *কেমনে প্রকাশি তব কত ভালোবাসি?* আর অত্যন্ত জটিল এই জিনিসটাকে ব্রায়ান বহু মাত্রিকতা দান কি নিপুনভাবেই না পেশ করলো! নাহ, তারপরও বলতে ইচ্ছে করছে, ভাগ্যিস রবি ঠাকুর জন্মেছিলেন।

*ইউএসএ থেকে*
mustahid@hotmail.com

# ভিন্ন

– সোনিয়া সুলতানা সালমা

আমার আর শ্রাবণীর পরিচয়টা একটু ভিন্ন রকমের। আমার ফুপুর সঙ্গে কিশোরগঞ্জে থেকে পড়ালেখা করি। ফুপু বিভিন্ন জায়গায় বাসা ভাড়া নিয়ে শেষে শ্রাবণীদের পাড়ায় বাসা করার সিদ্ধান্ত নেন।

এখানে বাসা নেয়ার পর মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কারণ, নতুন পরিবেশে, নতুন জায়গায় এসে কারো সঙ্গে সহজে মিশতে পারিনি।

এভাবে প্রায় এক বছর চলে গেল। শ্রাবণীদের বাসা এবং আমাদের বাসা এক সঙ্গে ছিল। আমাদের বাসার সামনে দিয়ে তাকে যাতায়াত করতে হতো। মাঝে মধ্যে মনে হতো মেয়েটা খুব অহংকারী।

শ্রাবণী আমার চেয়ে অনেক জুনিয়র ছিল। হঠাৎ একদিন তার সঙ্গে কথা হলো। আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে মেশা আরম্ভ করলো। আমি যেটা ভেবেছিলাম, দেখি মেয়েটা সম্পূর্ণ তার উল্টো। শ্রাবণী খুব মিশুক স্বভাবের একটি মেয়ে।

এভাবে রমজান মাস এলো। শ্রাবণী প্রতিদিন আমার সঙ্গে তারাবির নামাজ পড়ার জন্য আসে। প্রতিদিন নামাজ পড়ার ফলে আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড ঘনিষ্ঠতা হয়। খুব কাছ থেকেও আমরা একজন আরেকজনকে চিঠি লিখি, আমাদের দুজনের ভালোলাগা, ভালোবাসার চিঠি। কিন্তু দেখা হলে চিঠির কথা কখনো উল্লেখ করি না।

আমি চকবার খেতে পছন্দ করি। শ্রাবণী আমার জন্য প্রতিদিন একটি করে চকবার নিয়ে আসে। শ্রাবণী আমাকে কিছু দিতে পারলেই যেন আনন্দ পায়। হঠাৎ কিশোরগঞ্জে খবর গেল যে, আমার মা অসুস্থ।

আমি বাড়িতে চলে আসবো শুনে শ্রাবণী প্রচণ্ড ভেঙে পড়ে। বাড়িতে আসার আগের দিন শ্রাবণী আমার জন্য অনেক কিছু কিনে নিয়ে আসে। আমি বাড়িতে চলে আসার দিন শ্রাবণীর সে কি কান্না!

আমিও রাস্তায় অনেক কেদেছি। বাড়িতে আসার পর বুঝতে পেরেছি যে শ্রাবনীকে আমি কতোটুকু ভালোবেসেছি।

কিশোরগঞ্জ থেকে আসার পর শ্রাবণী আমাকে চিঠি পাঠায় এবং ফোনে কথা বলে। আমিও শ্রাবণীকে চিঠি দিই এবং তার চিঠির জন্য অপেক্ষা করি প্রতি মুহূর্তে। শ্রাবণীর চিঠি পেয়ে যেমন খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাই

তেমনি তার চিঠি পড়ে দুই চোখে পানি এসে যায়। মাঝে মধ্যে মনে হয়, তার এতো ভালোবাসার দাম কি দিতে পারবো?

শ্রাবণী আমাকে লেখে, সালমাআপা, তুমি চলে এসো, তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছে।

আমারও শ্রাবণীকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছে। কিন্তু বাড়িতে এসে এমন কিছু মানসিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি যে, কিশোরগঞ্জে যেতে পারিনি।

ঈদের সময় আমার জন্য শ্রাবণী প্রচুর গিফট পাঠায়।

ঈদের পরেও কিশোরগঞ্জে যেতে পারিনি। আমি জানি, শ্রাবণী আমার জন্য অপেক্ষা করছে। অপেক্ষার প্রহর যে কতো কষ্টের তা শুধু ভুক্তভোগীই জানে। শ্রাবণী আমার হৃদয়ের যে কোন জায়গায় অবস্থান করছে তা শুধু আমি জানি।

শ্রাবণী আমাকে বলে, সালমাআপা, তুমি পাশে থাকলে আমার জীবনে কোনো পুরুষের দরকার নেই। তুমি যেখানে থাকবে সেখানে আমিও চলে যাবো। আমরা দুজন সারা জীবন পাশাপাশি থাকবো।

এটা কি কোনোদিন সম্ভব! নিষ্ঠুর নিয়তি যদি আমাদের মাঝে বাধা হয়ে দাড়ায়? গভীর ভালোবাসা নাকি খোদারও সহ্য হয় না। আমি তো নামাজ পড়ে সব সময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন আমার জীবন থেকে শ্রাবণীকে কখনো দূরে সরিয়ে না নেয়। আমি তো জানি যে আমার মা-বাবা, ভাই-বোন, এরপর যদি আর কাউকে গভীরভাবে ভালোবেসে থাকি সে হলো শ্রাবণী। শ্রাবনী আমাকে ভালোবেসে তার জীবনের এক বড় স্বার্থ ছেড়েছে। শ্রাবণী তুই যেখানে, যেভাবে থাকিস সব সময় ভালো থাকিস অবশ্যই আমার ভালোবাসা নিয়ে। সামনে আসছে নতুন বছর এবং সেন্ট ভ্যালেনটাইনস ডে। নতুন বছরে আমাদের দুজনের সম্পর্ক আরো গভীর হোক এবং তোর জীবন আনন্দ ও হাসিতে খুশতে ভরে ওঠুক এই কামনা করি।

আমার হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা আবার নতুন করে তোকে উৎসর্গ করলাম।

*বাদলা, কিশোরগঞ্জ থেকে*

## রহস্যময়

এক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর ফ্যাক্সের দোকানে তার কাছ থেকেই আমার প্রথম কমপিউটারের হাতেখড়ি। ত্রিশোর্ধ এই হ্যান্ডসাম ব্যবসায়ী এসে প্রায়ই তার কম্পোজ করা চিঠির পৃন্ট নিতেন। লোকটাকে আংকল বলে ডাকতো বন্ধু।

একদিন লোকটাকে আমার প্রসঙ্গ টেনে বন্ধু বললো, আংকল, একটা চাকরি দেয়া যায়, খুব ভালো মেয়ে। এবার ফাইনাল দিয়েছে।

লোকটা এক নজর তাকিয়ে বললেন, আগে রেজাল্ট হোক, তারপর দেখা যাবে।

কলেজে থাকতে এক সিনিয়র প্রভাবশালী ছাত্রনেতার সঙ্গে পরিচয় সূত্রে দুজনের ভালোবাসাবাসি। বিজি নেতার সুনাম দিন দিন উজ্জ্বল হতে লাগলো। আজ এই মন্ত্রী, কাল ওই এমপির সঙ্গে তার মিটিং। তার দাপটে কলেজের স্যারও তাকে তোয়াজ করে চলতেন। তার একমাত্র গার্লফ্রেন্ড বলে আমিও বেশ মুড নিয়ে চলতাম। জুনিয়র ছেলেমেয়েরা ভয়ে আমাকে *আপামণি* বলে ডাকতো। সহপাঠী বা পরিচিত কেউ আমার সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বললেই মনে করে বসতাম সে আমার প্রেমে পড়েছে। কয়দিন নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিতাম।

সুন্দরী কি না জানি না। আসলে ওই স্বভাবটা আমার একটা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছিল। ভাবখানা এমন, শালা, জানিস না আমি কার প্রেমিকা? আমি তখন ওই ছাত্রনেতার প্রেমে বিভোর। কারণ, সে ইতিমধ্যেই বলেছে, আমিই তার প্রথম এবং শেষ। তার কিছু দুর্নাম আমার কানে এলেও বিশ্বাস করতাম না।

রিটায়ার্ড বাবার সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম রক্তের সম্পর্কের মানুষটা তাকে একদম সহ্য করতেন না। আমাকে বার বার সাবধান করা সত্ত্বেও ড্যামকেয়ার ভাব আমার।

নেতা–প্রেমিক সুযোগ পেলেই জাপটে ধরে চুমু খেতে চাইতো আমাকে। একদিন তার সঙ্গে ঢাকায় যাবার কথা বললে পারিবারিক অসুবিধার কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম তাকে।

বললো, জাস্ট ট্রাই করলাম তোমাকে। এ বছরেই তো তোমাকে বিয়ে করছি...।

আমার ওই লোভনীয় চাকরিটার কথা তাকে জানালে অগ্নিমূর্তি হয়ে সে জানালো, আমার বৌ হয়ে চাকরি করবে তুমি? অসম্ভব।

তথাস্তু।

ব্যবসায়ী লোকটার সঙ্গে একদিন চোখাচোখি হতেই বললেন, ভালো আছো? রেজাল্টের খবর কি?

পাত্তাই দিলাম না ভদ্রলোকটাকে।

রেজাল্ট প্রকাশের একদিন আগেই আমার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে খান খান হলো। শুনলাম পপুলার সেই ছাত্রনেতা, সোনার ছেলে, আমার প্রেমিক মদ আর মেয়ে মানুষ নিয়ে ফূর্তি করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের গুলিতে ধরাশায়ী! হরতাল, মিটিং, মিছিলে তোলপাড় হলো সারা শহর। রঙিন পোস্টারে ছেয়ে গেল অলিগলি। স্থানীয় পত্রিকার রিপোর্টে তার প্রেমিকা, গার্লফ্রেন্ড হিসেবে আমার নামও চলে এলো। দফায় দফায় পুলিশ, সাংবাদিক এসে নানান কথায় কোণঠাসা করে ফেললেন আমাকে। এক সময়ের দাপটে চলা নেত্রী(?) আমার অবস্থা হলো ডাস্টবিনের কাছে ঘুর ঘুর করা নেড়ি কুকুরের মতো। বাড়িতে বন্দী আমি সবার শত্রু হয়ে গেলাম।

তারপর ঢাকায় এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হলো আমাকে। ক্ষোভে–দুঃখে বিধ্বস্ত আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল ওই বাড়িতে। অনেক চেষ্টায় একটা রফতানিমুখী প্রতিষ্ঠানে ফোন অপারেটর কাম রিসেপশনিস্ট হিসেবে জয়েন করলাম নামমাত্র বেতনে। সমস্ত ভাবনা ভুলে কাজে ডুবে গেলাম।

প্রতিদিন চল্লিশ কিলোমিটার যাতায়াত করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও ভাবতাম, এই তো বেশ আছি। নিজ শহরে তো কাউকে মুখ দেখানোর কায়দা নেই আমার। নিমিষেই কেটে গেল চারটি মাস। এমডি সাহেব লোক ভালো হলেও চেয়ারম্যান আস্ত একটা শয়তান। কারণে–অকারণে তিনি নানান আলাপ জুড়ে দিতেন ফোনে। আমার মতো সুন্দরী ওই কাজ নিলাম কেন, বেতন বাড়িয়ে দিলে তাকে কি খাওয়াবো ইত্যাদি। চাকরিটার ভীষণ প্রয়োজন বলে নীরবে হজম করে যেতাম।

একদিন আমার সেই বন্ধুটি ফোনে একটা মোবাইল নাম্বার দিয়ে জানালো, ওই নাম্বারে ফোন করে লোকটার সঙ্গে আলাপ করো। বিস্তারিত আমি বলেছি। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সম্মানজনক চাকরি। বেতন চার গুণ বেশি। কথা বলে রাজি করাতে পারলে চাকরি কনফার্মড তোমার।

একটা মিসকল দিতেই লোকটা লাইনে এসে আমার পরিচয় জেনে বললেন, চিন্তার কারণ নেই। নির্দিষ্ট তারিখে ফোন করে কাগজপত্রসহ ঢাকায় তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন।

এদিকে চেয়ারম্যান আমাকে ডেকে বললেন, দেখো, আমার কথা শুনলে তুমি একটা মোবাইল পাবে, বেতনও বাড়িয়ে দেবো। আমি জানি সন্ধ্যার মধ্যে বাসায় চলে যেতে হয় তোমার। কিন্তু কাল ছুটির দিনে তো তুমি আমার সঙ্গে সারা দিন কাটাতে পারো।

সারা দিন কোথায় কাটাবো স্যার?

কেন, যে কোনো একটা ফাইভ স্টার হোটেলে!

ইচ্ছে হলো লোকটার মুখে থুথু ছিটিয়ে দিতে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম এই চাকরি আর না। হেসে বললাম, ঠিক আছে স্যার, কাল সকালে শেরাটনে রুম নিয়ে অপেক্ষা করবেন। আমি মোবাইলে জেনে নিয়ে একাই রুমে চলে আসবো।

বত্রিশ দাত বের কর কিমাকার একটা হাসি দিয়ে বললেন, ওকে, তাই হবে।

পরদিন মজা করার জন্য ফোন করে বললাম, স্যার কোথায়?

সে কি! আমি তো শেরাটনের সাত তলায়, ... নাম্বার রুমে, তুমি কোথায়?

দশ মিনিটেই পৌছে যাচ্ছি স্যার, আপনি একটু নিচে এসে দাড়ান।

ঠিক আছে, কুইক।

ওই দিনই এমডি বরাবর চিঠি লিখে চাকরি থেকে অব্যাহতি চাইলাম।

এবার লোকটাকে মোবাইল করে ছবি, সার্টিফিকেটসহ জায়গা মতো হাজির হলাম। কিন্তু একি! তিনি তো সেই ব্যবসায়ী আংকল। যাকে একবার আপমান করেছিলাম। চোখে শর্ষে ফুল দেখলাম আমি।

দীর্ঘ আলাপ শেষে ভদ্রলোক তার গাড়িতে আমাকে লিফট দিয়ে বললেন, আই উইল ট্রাই ফর ইউ মাই লেভেল বেস্ট। তোমার তো রেজাল্ট ভালো। কমপিউটার জানো এটাই বড় অ্যাডভানটেজ। প্লিজ ওয়েট এ ফিউ ডেজ।

কয়েকদিন পরেই মেইন অফিসে গিয়ে পরীক্ষা দিলাম। লোকটা সারাক্ষণই ছিলেন আমার সঙ্গে। তার স্বচ্ছতা এবং অমায়িক ব্যবহারে আমার অতীতের সেই মুদ্রাদোষে আক্রান্ত হলাম আবার। ভাবলাম এই আংকলটা হয়তো ভালোবেসে ফেলেছেন আমাকে। তা না হলে এতো কিছু করবেন কেন আমার জন্য।

কথামতো ফোন করলে লোকটা বললেন, গুড নিউজ দেবো আজকে। তবে কষ্ট করে আমার ফ্ল্যাটে আসতে হবে তোমাকে।

ফান করছেন? মনে করে বললাম। দেখুন, আমি এতো চিনে উঠতে পারবো না। প্লিজ, আপনি একটু আসুন।

লিফটে টপ ফ্লোরে উঠে লক খুলে তার পেছনে রুমে ঢুকে দেখি সুন্দর গোছানো ফ্ল্যাটে কেউ নেই। বললাম, আন্টি কোথায়?

বিয়ে করলে তো আন্টির প্রশ্ন আসবে।

আমার চাকরির জয়েনিং লেটারটা হাতে দিয়ে বললেন, তুমি কাল-পরশু যে কোনোদিন জয়েন করতে পারো। মাস শেষে হাজার টাকা! আর কয়েকদিন পরেই হয়ে যাবো *আমি কার খালু,* তাই না? সুতরাং আজ আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললাম, আপনার কথা শুনবো না আমি? বলুন কি কথা।

দেখো, আমি কাউকে আঘাত বা জোর করে কিছু আদায় করতে রাজি নই। আমি তোমার পূর্ণ আন্তরিকতা চাই। আমাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে বেডরুমে নিয়ে যেতে চাইলে হতবাক হয়ে বললাম, আংকল হয়ে আমার প্রতি আপনার প্রস্তাবটা কতোটুকু শোভন?

মনে করো আমার নামটাই আংকল।

বললাম, আপনি যা ভেবেছেন সে রকম আমি নই। তবে চাকরিটা ভীষণ প্রয়োজন সেটা সত্যি। কিন্তু তার বিনিময়ে...।

তুমি গিভ অ্যান্ড টেক-এর কথা ভাবছো? নেভার। আমি জানি তুমি রুচিশীলা একটা ভদ্র মেয়ে। আসলে আমার প্রস্তাবটা তোমাকে নিয়ে অন্য একটা পরিকল্পনা করে, প্লিজ!

শত বোঝানোর পরেও তার ওই একই মিনতি!

এবার সেই মৃত ছাত্রনেতার পরিচিতা এবং আরো এক নামকরা রাজনীতিবিদদের রিলেটিভ বলে একটু জাহির করলে লোকটা জ্বলে উঠে বললেন, আই এম নট রেডি টু হিয়ার এনিওয়ানস লেকচার। উই গিভ বার্থ টু দিজ পলিটিশিয়ানস।

নিরুপায় হয়ে বললাম, আমার প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা থাকলে নিজের ফ্ল্যাটে এনে অপমান করতে পারতেন না। আমার অসহায়ের সুযোগ নিতে চাচ্ছেন আপনি। কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

লোকটা হঠাৎ মোমের মতো গলে আমাকে ধরে বললেন, তোমাকে ভালো না বাসলে এতো দূর এগোতাম না কোনোদিন। বিমুখ না করলে আমার উষ্ণ ভালোবাসা সব সময় তোমার জন্যই...।

তার কোমল ছোয়ায় বিমোহিত একটি কথাও বলতে পারলাম না আর। কোলে উঠিয়ে আমাকে বেডে নিয়ে গেলেন তিনি। জীবনে ওই প্রথম হার মানলাম।

নতুন চাকরির একপক্ষ কাল অতিক্রম হলেও লোকটা আর কোনো খোজ নিলেন না আমার। আমি রিং না করলেও অফিসে ফোন করেও তো ভদ্রবেশী লোকটা একবার খবর নিতে পারতেন। নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিতাম, হয়তো বেডে নেয়ার জন্যই আমাকে ভালোবাসার গল্প করেছিলেন।

কিন্তু না, হঠাৎ অফিসে ফোন করে লোকটা বললেন, আমার প্রতি তোমার এই ভালোবাসা? বলেছিলাম না,আমি এখন কার খালু? ইট ইজ ফ্যাক্ট, বাট আই লাভ ইউ টু মাচ।

সব ভুলে কিসের মোহে যেন আবারও ছুটে গেলাম তার কাছে।

মান-অভিমান শেষে একটা মোবাইল গিফট দিয়ে ওই দিন ঢাকার বাইরে থাকার কথা জানালেন।

এ রকম সত্য-মিথ্যার লুকোচুরি খেলা খেলে যাচ্ছি দুজনে। তার ভাষায় আমি নাকি মোটেই আন্তরিক নই তার প্রতি। রসবোধ হীন। আমার মধ্যে কোনো দুষ্টুমি, চঞ্চলতা নেই। সব সময় একটা তটস্থ ভাব। আরো বলেন, ইউ লুক টু সেক্সি, বাট ইন বেড ইউ আর এ পিওর ভেজিটেরিয়ান।

ভীষণ মুডি, হেভি সেক্স পাওয়ারড পিকিউলিয়ার লোকটা চান আমি সারাক্ষণই দুষ্টুমিতে মেতে থাকি, কৌতুক করি। ঘনিষ্ঠ হয়ে তার পছন্দের রেসলিং বা কমেডি ছবি দেখি। তার চুলে বিলি কেটে তাকে আদর করে উত্তেজিত করা। সময়ে-অসময়ে তার সঙ্গে বেডে গিয়ে *এই শেষ* বলে আমাকে বার বার স্নান করিয়ে দারুণ আনন্দ পান লোকটা।

আশ্চর্য! একজন শিক্ষিত লোক হয়েও কোনো পত্রিকা বা টিভি নিউজ দেখেন না। যতোসব ব্যঙ্গাতক, জোকস-এর বই ছাড়াও নানান কার্টুন পত্রিকা এবং বিদেশি কমেডি সিনেমার সিডি তার সংগ্রহে। যৌন বিজ্ঞানী ফ্রয়েড-এর অনেক বই তার কাছে সংরক্ষিত।

একবার আমাকে দুটি গল্প শোনালে গম্ভীর হয়ে বললাম, গল্প দুটি যাযাদি দিনের পর দিন কলামে অনেক আগেই পড়েছি আমি।

তার ধারণা, যাযাদি রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত। *অবাক পৃথিবী, প্রেমলীলা* ছাড়াও ইদানীং যাযাদির বিশেষ সংখ্যাগুলো মুড নিয়ে পড়েন।

অথচ আমার মুখ থেকে কোনো গঠনমূলক কথা, এমনকি আমার পছন্দের কৃকেট খেলাকে কটাক্ষ করলে রাগের মাথায় তাকে রামছাগল বলে ক্ষমা চাইলে হেসে বললেন, এতোদিনে তোমার মুখ থেকে একটা সুন্দর কথা শুনলাম।

ওই দিন তার প্রতি আবার আমার তটস্থততার কথা জানালে সাহস করে বললাম, আমার সব তো কেড়ে নিয়েছেন। আন্তরিকতা বা তটস্থতার জন্য আপনিই দায়ী। আমাকে বৈধতা দিন, ন্যাচারালি সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

এই যে বললে, আমি তোমার সব কেড়ে নিয়েছি। অর্থাৎ মন থেকে তুমি কিছুই দাওনি আমায়। সুতরাং বৈধতার প্রশ্নটা অবান্তর।

রেগেমেগে বললাম, আমাকে নিয়ে আপনার এই উন্মাদনার পরিণতির কথা একবার ভেবেছেন? আমি আর কতো সতর্ক হবো? আমাকে মুক্তি দিন। না হলে বলুন আপনি আসলেই কি চান?

অন্য রকম একটা কাছে টেনে বললেন, আমি চাই তোমার অকৃতিম ভালোবাসা। যেদিন মনে করবো, তুমি আমাকে আপন করে নিতে পেরেছো, বিশ্বাস করো ওই দিনই সব কিছুর বৈধতা পেয়ে যাবে তুমি।

রহস্যময় লোকটার কাছে বার বার হার মানছি। জানি না তার মনে কি আছে? তার ভাষায়, আমার অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং শেষ রক্তবিন্দু উজাড় করে তাকে আপন করে নেয়ার চিন্তা করি, সেটা কি আকাশ কুসুম হবে?

*নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

## আলোড়ন

– আনোয়ার আলী

সুবাস্তু শপিং সেন্টারে ঢোকার মুখেই প্রায় এক যুগ পরে বীথির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। জানতাম বীথি এখন ঢাকায়। চাকরি সূত্রে আমিও এখন এই শহরের বাসিন্দা।

তাকে দেখে আশ্চর্য হই! এতো বছর পরেও তারা লাবণ্য, অপরূপ দেহ, সৌষ্ঠবের তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। আমরা চিত্রার্পিতের মতো দাড়িয়ে পড়লাম। চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টি আনত হলো। আমাদের মুখমণ্ডল একটু রক্তিম হলো কি? কি জানি? আনমনা হলাম। পরক্ষণই স্বাভাবিক। জিজ্ঞাসা করি, কেমন আছো?

ভালো, আপনি?

আমিও ভালো।

দৃষ্টি পড়লো বীথির গা ঘেষে দাড়ানো ছোট্ট মেয়েটার প্রতি। অনেক বছর আগে কালো কোকড়ানো চুলের ফাকে ফোটা পদ্মর মতো এমনি এক কমনীয় মুখচ্ছবি মানসপটে ভেসে উঠলো। আদর করে গাল দুটো টিপে বললাম, মেয়ে বুঝি?

হ্যা।

এতোটুকুতেই আমাদের কথা ফুরিয়ে গেল।

সে বললো, আসি।

আচ্ছা। আমি বললাম।

আমার বর্তমান নিস্তরঙ্গ জীবনে বীথি একটা প্রচণ্ড আলোড়ন তুলে চলে গেল।

বীথি যখন মরাল গতিতে এক একটা সিড়ি পেরিয়ে তার গাড়ির দিকে এগোচ্ছিল তখন তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো চার পাশের এই যে এতো মানুষ, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার স্মৃতিভরা এদের সবার জীবন এক একটা ইতিহাস। বীথি বা আমি কেউ এর ব্যতিক্রম নই।

বীথি আমার কাজিন। সেই সুবাদে ছোটবেলা থেকেই তাদের বাড়িতে অবাধ যাতায়াত। সাধারণ মেলামেশার মাঝেই বয়ঃসন্ধিকালে আমরা পরস্পরকে অন্য রূপে অনুভব করি। আমাদের সম্পর্ক ভিন্ন পথে বাক নেয়।

বীথির বাবা ছিলেন শহরের একজন নামকরা উকিল। তার ছিল যেমন পসার তেমনি ছিল প্রবল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি। বিপরীতে আমি হলাম এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। পিতা সরকারি চাকরি করতেন। বলার মতো ধন-সম্পদ না থাকলেও আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য ও বংশ-গরিমা ছিল ঈর্ষণীয়।

বাবা–মা আমাদেরকে স্বপ্ন দেখাতেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে তারা যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠা করতেন না।

পরবর্তী সময়ে বীথির সঙ্গে তিনটি বিষয়ে মিল খুজে পেয়েছিলাম। সেগুলো হলো, আমরা দুজনাই ছিলাম সুন্দর, অন্তর্মুখী ও লাজুক প্রকৃতির। কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠানে মূল পর্বে আমরা উভয়েই অন্তর্হিত হয়ে যেতাম, হই হুল্লোড় এড়িয়ে একটু পরে নিজেদের আবিষ্কার করতাম অপেক্ষাকৃত কোনো নির্জন স্থানে। বুঝতাম আমরা দুজনে অন্য ভুবনের বাসিন্দা।

এটি আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলাম এক খালার বিয়েতে। এই উপলক্ষে সেবার মামাদের বাড়িতে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছিলাম। একদিন বিকেলে হাটতে হাটতে মামাদের আম বাগানে গিয়েছিলাম। সেখানকার নির্জন পরিবেশে বীথিকে দেখলাম, একটা দোলনায় আপন মনে দুলছে। আমাকে দেখে থেমে গেল।

বললাম, কি ব্যাপার? বিয়ে বাড়ির হই চই ভালো লাগছে না?

না।

পায়ে পায়ে তার কাছে এগিয়ে গেলাম। গাছের পাতার ফাক গলিয়ে গোধূলির আলোয় তার সুন্দর মুখখানি রক্তাভ হয়ে উঠলো। ঘনায়িত তিমির বন্যার ওপরে স্থির দুটি আখি পদ্ম হলো লজ্জাবনত।

দমকা হাওয়া এলো যৌবনে। চোখের সামনে দেখলাম, সবার আদুরে মিষ্টি মেয়েটা ক্রমে ক্রমেই প্রস্ফুটিত হতে হতে এক অসামান্য রূপসী তরুণীতে পরিণত হয়েছে। সে যখন কাছে আসতো তখন সুরভিতে জেগে উঠতো আমার আবেগ।

এই পর্যায়ে বীথির অভিভাবকরা সতর্ক হলেন। কিন্তু ততোদিন দেরি হয়ে গেছে। ততোদিন উভয়ের বুকের মধ্যে বাসা বেধেছে অনেক স্বপ্ন। মাঝে মধ্যে এক এক ঝাপটায় স্বপ্নের সেই আস্তরণ ঝরে পড়ে। আভাস–ইঙ্গিতে দুজনাই তা টের পাই। প্রতিক্ষণ গুন গুন করে অনুরণিত হয় অতি পরিচিত এক শব্দ, একে অপরকে যেন বলছি ভালোবাসি...।

এরই মাঝে গ্রীষ্মের ছুটিতে বীথি তার মায়ের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলো। এক বিকেলে মামার বাড়িতে পৌছে দেয়ার জন্য তার সফরসঙ্গী হয়েছিলাম। সেদিন রিকশায় পাশাপাশি বসে কথা হয়েছিল অনেক। কিন্তু তার শরীরের ছোয়া এড়াতেই ছিলাম তটস্থ। আমার এই গুটি গুটি ভাবে সে হেসে ফেললো।

পরদিন দুপুরে আকস্মিক অফিস থেকে বাড়িতে এসে দেখলাম দোতলায় আমার ঘরে বীথি নিবিষ্ট মনে একটা গল্পের বই পড়ছে। আমাকে দেখে সে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে এবং চলে যেতে উদ্যত হয়। চকিতে মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। রেকর্ড প্লেয়ারে নাটকীয়ভাবে বাজিয়ে শোনালাম প্রিয় গায়কের *আমি এত যে তোমায় ভালোবেসেছি* গানখানি।

গানে গানে, সুরে সুরে অনুচ্চারিত ভালোবাসার এই উপস্থাপনায় বীথির দুচোখের তারা বিস্ফোরিত হয়। দরজার দুটি কপাট ধরে আমার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকলো। সেদিন আমরা কোনো কথা বলিনি। কিন্তু আমাদের হয়ে অবরুদ্ধ কথাটি বলে গেল সেদিনের অলস দুপুর, অনন্তকালের সেই মুহূর্ত।

তার ফিরে যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় আরেকটি ঘটনা আমাদের মধ্যকার সব দ্বিধার অবসান ঘটায়। সেদিন ছিল গুমোট ভাব। সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে ছাদে গিয়ে আবছা আলো–ছায়ায় লক্ষ্য করলাম, বীথি কার্নিশ ঘেসে অপার মগ্নতায় দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাকে এই অবস্থায় দেখে দারুণ লোভ হলো। চুপি চুপি পেছন থেকে এসে আচমকা তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম।

বীথি বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে দাড়ালো এবং আমাকে দেখে অবাক হলো।

আমি দারুন সাহসে তার স্ফুরিত অধরে আলতো করে আমার ঠোট ছোয়ালাম।

বীথিও অভাবিত সাড়া দিল।

আমাদের এই সম্পর্কের কথা অবশ্য বেশি দিন চাপা থাকলো না। নানানভাবে তা পল্লবিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে লাগলো বীথির বাবার কঠিন মুখখানি। শুনলাম তারা বলেছে, আমি নাকি *বামন হয়ে চাঁদে* হাত বাড়িয়েছি।

একদিন অফিস থেকে ফিরলে ছোট বোন বললো, ভাইয়া, আজ দুপুরে বীথিআপুর আব্বু এসেছিলেন। মায়ের সঙ্গে তোমাদের নিয়ে কি যেন বলছিলেন।

আমি প্রমাদ গুণলাম।

রাতে মা জিজ্ঞাসা করলেন, খোকা, এসব কি শুনছি?

কি মা?

তুই নাকি প্রায়ই যশোরে যাস। বীথির সঙ্গে ঘুরে বেড়াস।

আমি নির্বাক।

মা আত্মস্বরে বললেন, তুই বীথির কথা ভুলে যা বাবা। তারা বড়লোক। তাদের সঙ্গে আমাদের মানায় না। তুই কি চাস, তোর জন্য আমাদের আত্মীয়তা নষ্ট হোক?

সে রাতে আর ঘুম এলো না। এরা কেউ আমাদের দুজনার মনের কথা বুঝলো না। নিজেদের স্বার্থটুকু কেবল দেখলো। এতোদিন বুকের ভেতর যে দুঃখ পাথর চাপা ছিল সেখানটাই আঘাত করলো। ক্ষোভে, দুঃখে চোখ দুটো প্লাবিত হলো।

সে অনার্স পরীক্ষা দিয়েছে। খবর পাঠিয়েছে দেখা করার জন্য। অনেক দিন পর *জেস টাওয়ার*–এ আমাদের দেখা হলো। সে আমার জন্য কিছু জিনিস কিনলো এবং জানালো আগামী সপ্তাহে তার জন্মদিন।

বীথি চাইছিল আমিও তার জন্য কিছু কিনি।

কিন্তু সেদিন আমি কিছুই কিনিনি। আসলে ততোদিনে বীথির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বেদনাদায়ক সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলেছি।

আমার বিষণ্ন ভাব লক্ষ্য করে সে উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কি হয়েছে?

প্রথমে কিছুই বলতে চাইনি। কিন্তু বিথীর পীড়াপীড়িতে সব কিছু বললাম। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমি সব জানি। আমার ওপরে অনেক চাপ। তবে তুমি চিন্তা করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু বিপরীতমুখী ঘটনা দ্রুত ঘটতে লাগলো। শুনতে পেলাম বীথির বিয়ের ব্যাপারে জোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

জানতাম বীথি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে। এলোও একদিন। মলিন চেহারা। উদাস কণ্ঠে বললো, তুমি হয়তো শুনেছো, আব্বা আমার জন্য পাত্র ঠিক করেছেন।

আমতা আমতা করে বলি, ভালো তো।

তুমি আমাদের বিষয়ে কিছু ভাবোনি?

ভেবেছি। অনেক ভেবেছি। কিন্তু কোনো কূল–কিনারা পাচ্ছি না।

কেন?

কারণ, আমাদের বিয়ে হোক এটা কেউ চায় না। আমি তাকে বোঝাই, বীথি, তুমি ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছো, আমাদের সংসারে এলে কষ্ট পাবে।

আমি এসব মানি না। তোমরা কিসে কম? সে আর্তনাদ করে ওঠে।

তবুও আমি নীরব। কিন্তু মন তখন বৈশাখি ঝড়ে লণ্ডভণ্ড। ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত হচ্ছি।

বীথি সময়ের নতুন প্রেক্ষাপটে তার জীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে একটুও দেরি করলো না। সে আর কিছু না বলে একটু পরে চলে গেল।

বীথির সঙ্গে আমার সম্পর্কের সেই শেষ।

এর কয়েক মাস পরে এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে বীথির বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু তাকে জীবনে কোনোদিন ভুলিনি।

বীথি যেমন করে আজ চলে গেল তেমনি আলোড়ন তুলেও হয়তো আবার কোনোদিন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দিতে পারে এই মহানগরীর কোনো বিপণী বিতানে, রাজপথে কিংবা লক্ষ মানুষের ভিড়ে, অন্য কোথাও।

তাকে কখনো জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হবে না, এতোদিন কোথায় ছিলে? সেই অধিকার হারিয়েছি। তবু এতোটুকু তো বলতে পারি, বীথি, তুমি কেমন আছো?

*খুলনা থেকে*

# শিকল

– আলীম আল রাজী

বলতে গেলে হঠাৎ করেই করবীর সঙ্গে প্রেম হয়ে গেল। ইউনিভার্সিটি বন্ধ। বাড়িতে ব্যস্ত সময় কাটে। আইডলি বিজি।

বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া স্কুলের মেয়েদের না দেখার ভান করে খুব আগ্রহ নিয়ে দেখি। আসলে সবাইকেই খুব ভালোভাবে চিনি। কিন্তু একটা বয়সে চেনা মেয়েগুলোই কেমন যেন অচেনা হয়ে যায়। দেখতে কি যে ভালোলাগে! বুকের মাঝে ব্যথার মতো একটা অবর্ণনীয় অনুভূতি হয়। দেখার লোভটা কোনোমতেই সামলাতে পারি না।

স্কুলের পথে একদিন হঠাৎ করেই দেখি একটা অচেনা মেয়ে। খুব সুন্দর। চেহারায় এক ধরনের স্নিগ্ধতা আছে। কয়েকদিনের মধ্যেই পরিচয় এবং কেমন করে যেন প্রেমও হয়ে গেল। বলতে গেলে তার আগ্রহেই। আমি ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স পড়ি। সম্ভবত এই বিষয়টি প্রভাব হিসেবে কাজ করেছে।

করবী ক্লাস নাইনে পড়ে। তাদের এলাকায় ভালো স্কুল না থাকায় আমাদের পাশের গ্রামে তার মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতে এসেছে। ওই বাড়িতে আমার অবাধ যাতায়াত। তার এক মামাতো বোনের সঙ্গে এক সময় আমার দীর্ঘদিন সম্পর্ক ছিল। এক বছর আগে তার বিয়ে হয়ে যায়। করবীকে সব খুলে বললাম।

সে ব্যাপারটাকে খুব সহজভাবেই নিল।

প্রতিদিন দেখা হয়, কথা হয়। এরপরও আবেগ উপচে পড়া চিঠি বিনিময় হয় প্রতিদিন। কিন্তু সুখের দিনগুলো ফুরিয়ে যায় খুবই দ্রুত।

এক সময় ছুটি শেষ হয়। ক্যাম্পাসে যাওয়ার সময় হয়। নিঃশব্দে কাদতে কাদতে ট্রেনে উঠি সময়ের প্রয়োজনে।

ক্যাম্পাসে প্রতি সপ্তাহে কনিকার দুই তিনটি চিঠি পাই। আমিও লিখি। এভাবেই দুই বছর কেটে গেল।

ছুটিতে বাড়ি এসে নিয়মিতই দেখা হচ্ছে করবীর সঙ্গে। দীর্ঘক্ষণ ধরে অপ্রয়োজনীয় কতো কথা দুজনেই সাগ্রহে বলি আর শুনি। কিন্তু Our sincerest laughter is fraught with some pain – আমাদের চরমতম আনন্দের মধ্যেও কিছু না কিছু দুঃখ মেশানো থাকে। একদিন ইংরেজ কবি শেলি–র এই দর্শনের বাস্তব রূপ প্রত্যক্ষ করার দুর্যোগ এলো।

আমাদের সম্পর্কটা শুরু থেকেই গোপন ছিল। আমার দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু শুধু ব্যাপারটা জানতো। একদিন করবীর মামাদের গ্রামের আমার এক বন্ধুর কাছে, যে আমাদের সম্পর্কের কথা জানতো না, তার করবীর সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি দেখতে পেলাম। তার সঙ্গে বায়োলজিকাল এবং এন্টিলজিকাল রিপ্রডাকশনের রগরগে বর্ণনাও শুনলাম।

আমার মধ্যেকার মিসির আলীর লজিক বলে যা দেখেছো শুনেছো সবই ঠিক। আর হিমু প্রবল প্রমাণকেও অগ্রাহ্য করতে চায়। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি দাড়িয়ে আরেকটু খোজ নিলাম। জানতে পারলাম মামাতো, ফুপাতো, খালাতো, পাড়াতো ভাই এমন অনেকের সঙ্গেই তার সম্পর্কের কথা।

আমার ঠোটের কৌমার্য নষ্ট হয়েছে প্রথম প্রেমিকার কল্যাণে। আরো কিছু তরুণী, যুবতীর মুখমণ্ডলের কুমারীত্ব হরণের দায়িত্ব আমিই স্বীকার করছি। এছাড়া করবীর সঙ্গে মাঝে মধ্যে স্বল্পমেয়াদী চুমু এবং ড্রাই টেস্ট পর্ব ছাড়াও একদিন সোয়া এক ঘণ্টার ম্যারাথন সিটিংয়ে হালকা সবুজ জামার নিচের পর্বত সংকুল পথে দুঃসাহসী হাতে অবুঝ অভিযানে অংশগ্রহণ নিজেকে সাধু পুরুষ ভাবতে উৎসাহ দেয় না। কিন্তু পরের কারণে নিজের প্রেমিকার স্বার্থ বলি দেয়াকে মেনে নিতে পারলাম না।

প্রেমিকার পরম আকাঙ্ক্ষিত উর্বর জমি বর্গা দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির মতো বৈষয়িক বুদ্ধি কিংবা উদারতা কোনোটিই আমার ছিল না। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে আমার হৃদয়ে ভালোবাসার পাশাপাশি ঘৃণা এবং ঈর্ষাও আছে। আমার ঈর্ষাকে করবীর প্রতি ভালোবাসা অতিক্রম করতে পারেনি।

তাই সব ধরনের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল।

এরপরও প্রিয় গান শোনার পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে যেমন তার রেশ মনে রয়ে যায় তেমনি একটা অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো কয়েক মাস।

একদিন করবীর বিয়ে হয়ে গেল।

দীর্ঘ আট বছর তার সঙ্গে দেখা নেই। তবুও অদৃশ্য কোনো শিকলে এই মেয়েটি যেন মনে বাধা আছে। নড়তে-চড়তে সব সময়ই ঝনঝনিয়ে হৃদয়ে বাজে।

*কালাবহ, জামালপুর থেকে*

## অপত্য

সমস্যাটা সম্পর্কে এক পর্যায়ে ডাক্তার সাহেবকে কথাটা বলেছিলাম। ও হ্যা, যে প্রসঙ্গে কথাটা লিখেছি সে বিষয়ে আরো বিস্তারিত লেখা প্রয়োজন। গিয়েছিলাম একজন স্কিন অ্যান্ড ভিডি বিশেষজ্ঞের কাছে। কথার এক ফাকে তাকে বলেছিলাম, ডাক্তার সাহেব, আমার সেক্স কমে গেছে।

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আগে বিয়ে করুন, তারপর সব ঠিক করে দেবো।

এটা আজ থেকে প্রায় আট বছর আগের কথা। মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে যায়। ডাক্তার সাহেবের কাছে আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সত্যি সত্যিই যে ব্যাপারটা আমাকে একেবারে ভাবাতো না তেমন ছিল না মোটেও।

সময় গড়িয়ে যায়, এক সময় আমার বিয়ের কথা ওঠে। আত্মীয়স্বজনকে বলা হয় মেয়ে দেখতে। ব্যাপারটা আমারও কানে আসে। চমকে উঠি আমি। শেষ পর্যন্ত তাহলে ধরা পড়তে যাচ্ছি। সম্ভাব্য বিয়ের ব্যাপারে আমাকে গ্রামের বাড়ি পাঠানো হয়। মামা-মামি একটা মেয়ের খোজ এনেছেন। এদিকে আবার চাচা বাসায় আরেকজন পাত্রীর কথা ভেবেছেন।

কি আর করা! বাড়ি যেতে হলো। কিন্তু যে মেয়ের কথা মামা-মামি বলেছেন তার বিয়ে নাকি আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে প্রবাসী আত্মীয়ের সঙ্গে। যাক, আমাকে ফিরে আসতে হলো। ঢাকায় এলাম।

চাচার দেখা মেয়ের সঙ্গে বিয়েটা ঠিক হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। আমি আর বেশি টানা হেচড়ার মধ্যে গেলাম না। যেমন এটা না, ওটা না। এই বেশি বেশি করে পাত্রী দেখা আর কি! কিন্তু ভেতরে ভেতরে আগের দুশ্চিন্তাটা আমাকে নাড়া দিতে থাকলো। কাজেই প্রথমে কথাটা চাচার কাছেই বললাম। আরো বললাম, কয়েক বছর আগের মাজার সমস্যার কথাটাও।

চাচা আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনলেন, পরামর্শ দিলেন হাফবয়েলড ডিম খেতে। আরো বললেন, শিগগিরই যেন একজন নিউরোসার্জনের সঙ্গে যোগাযোগ করি।

সময়টা ঘনিয়ে এলো। শাদামাটাভাবেই দুই পরিবারের আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতিতে আমার বিয়েটা হয়ে গেল। নববধূকে কিভাবে কথাটা বলবো সেগুলোই ভাবছিলাম। সারা রাত তার সঙ্গে অনেক গল্প হলো। ভোরের দিকে তাকে বললাম, মানসী, আমাকে একজন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

শুনে সে কিছুটা ভড়কে গেল। তাকে সাহস দিয়ে বললাম, তেমন কিছু না। ডাক্তার না দেখালে আমি তোমার সঙ্গে সেক্স করতে পারবো না।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা এমনি, আমরা যে কারো সঙ্গেই সেক্স সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করতে লজ্জা করি। কেউ কেউ বলে, ব্যাপারগুলো গোপনীয়। তাই আলোচনা করাটা ঠিক না। অথচ বর্তমানে সেক্স সংক্রান্ত ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক এগিয়েছে। অনেক চিকিৎসা সম্মত সমাধানও আছে। মেডিকাল সায়েন্স সেক্স সংক্রান্ত সব চিকিৎসা সহজ করে দিচ্ছে।

আমি এমন এক দম্পতির কথা জানি যাদের পাচ বছরের একটি ছেলে আছে তাদের ইচ্ছা আরো একটি সন্তান হোক। বিশেষ করে ভাবীর আগ্রহটা একটু বেশি। কিন্তু তাদের সন্তান হচ্ছে না। এখানে একটি কথা না বলে পারছি না। এক পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে তিনটি ওষুধের সমন্বয়ে সেবন করে এক সন্তানের গর্বিত পিতা হতে পেরেছি। কথা প্রসঙ্গে ভাবীকে আমার স্ত্রী সেটা বলেছিল। ভাবীর সাফ জবাব, আপনার ভাই কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না। ভাবী তার স্বামীকে গুড়া করে চায়ের সঙ্গে ওষুধগুলো খাওয়াতে চান। বুঝুন আমরা কোথায় আছি! আমার ওষুধের সমন্বয় তার বেলায় সঠিক নাও হতে পারে। এ প্রসঙ্গে পরে বলছি।

অনেক চিন্তা–ভাবনার পর স্থির করলাম একজন বিদেশ ফেরত নিউরোসার্জনের কাছে যাবো। তখন ডাক্তার সাহেব সবে উচ্চতর বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরেছেন। তার সঙ্গে দেখা করলাম। সমস্যার কথা বিস্তারিত খুলে বললাম। ডাক্তার সাহেবকে এও জানালাম, আমি সবে বিয়ে করেছি। মেয়েলি ব্যাপারগুলো ভালো করে বুঝি না।

ডাক্তার সাহেব একে একে আমাকে মেয়েদের আটাশ দিনের মাসিক চক্রটা বোঝালেন। যেমনটা চোদ্দতম দিনে ডিম্বাণু ওভারির খুব কাছে আসার কথা। প্রথম দুই সপ্তাহ থেকে বিশতম দিন পর্যন্ত সাবধানে থাকার কথা। বিশেষ করে চোদ্দতম দিনে মেলামেশায় ডিম্বাণু এবং শুক্রাণুর সমন্বয় ঘটানোর কথা। বিশেষ করে আটাশ দিন পর পরবর্তী মাসিক নাও শুরু হওয়ার কথা। বললেন, মাসিক চক্রের নিয়ম ভঙ্গ করে দেরিতে শুরু হওয়ার কথা। অনেক ক্ষেত্রে এটা নিয়ম–নীতির তোয়াক্কা করে না এটাও বললেন। পিল খাবার কথা, মারভেলন, না নরডেট এটা নিয়ে তার দোটানার কথা। এভাবে তিনি আমাকে বিশদভাবে বোঝালেন। আমার সমস্যাগুলো শুনে আমাকে কিছু কিছু পরামর্শও দিলেন। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে আমার সঙ্গে তিনি কথা বললেন।

ডাক্তার সাহেবের কথায় মুগ্ধ হলাম। তাকে ডাবল ফিস দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি নির্ধারিত ফিসই নিলেন।

যাহোক, ডাক্তার সাহেবের কিছু কিছু টিপস আমার কাজে লাগলো। সময় গড়িয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু আসল কাজ কিছুতেই হচ্ছিল না। যোগাযোগ করলাম বারডেমের অ্যান্ডোক্রাইনলোজি বিভাগে।

সংশ্লিষ্ট ডাক্তার সাহেব আমাকে দুটো হরমোন টেস্ট করাতে লিখে দিলেন।

রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম।

রিপোর্ট দেখে তিনি আমাকে একটা ওষুধ লিখে দিলেন। বললেন, এটা তিন মাস খেতে হবে।

গেলাম শাহবাগের ওষুধের দোকানে। দোকানি আমার সঙ্গে নিচু গলায় বলছিল। তার বক্তব্য, পেছন থেকে ওষুধ এনে দিতে পারবে। তবে দাম একটু বেশি পড়বে।

অগত্যা নয় টাকা করে প্রতি ট্যাবলেট কিনতে হলো। এটা খাওয়ার পর অবস্থার কিছু উন্নতি হলো। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সন্তানের মুখ দেখার জন্য আমাকে আরো অপেক্ষা করতে হলো।

নিরাশার মধ্যে কেটে গেল আরো কিছু সময়। এবার একজন সাইকিয়াটিস্টের শরণাপন্ন হলাম। ধানমন্ডির এই ডাক্তার আমাকে একজন ফার্টিলিটি এক্সপার্টের নাম লিখে দিলেন। মরুভূমির মধ্যে পথহারা পথিকের মতো পথের ঠিকানা পেলাম। কিন্তু হায়! ডাক্তার সাহেবকে দেখানার জন্য তার এটেনডেন্টের কাছে নাম লেখানোর সময় এটেনডেন্ট ভদ্রলোক আমার নাম দেখে বললেন, ডাক্তার সাহেব মেয়েদের সমস্যা সম্পর্কে দেখেন।

পরে জেনেছিলাম ডাক্তার সাহেব যুগলের সমস্যা নিরূপণ করে ওষুধ দেন। কিন্তু বিধি বাম, যেহেতু এটা অনেক পরে জেনেছিলাম। সেখানেই অন্ধকারের মধ্যে আলোর ঠিকানা খুজে পেলাম। তখনই সেই স্কিন এবং ভিডি এক্সপার্ট ডাক্তার সাহেবের কথা মনে হলো।

ডাক্তার সাহেব প্রফেসর। বয়স্ক মানুষ। বললেন, আমার সমস্যার সমাধান করে দেবেন। কাছে ডাকলেন, আমার প্যান্টের জিপার খুলতে বললেন। এটা একটু নিচে নামান। সব কিছু হলো। ডাক্তার সাহেব আমাকে কটা টেস্ট করাতে বললেন। রিপোর্ট পেলেই যেন তার সঙ্গে দেখা করি।

প্যাথলোজিকাল ইন্সটিটিউটে সব পরীক্ষা করালাম।

মেডিকাল অ্যাসিস্টান্ট যেভাবে স্পেসিমেন সংগ্রহ করলো সেটা আর বলতে চাই না।

রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তার সাহেবের কাছে গেলাম। ডাক্তার সাহেব তিনটি ট্যাবলেটের সমন্বয়ে ব্যবস্থাপত্র দিলেন। লিখে দিলেন যেন এক মাস খাই।

ওষুধ খেতে লাগলাম। কিছু টের পাচ্ছিলাম না। এক মাস পর আবার তার সঙ্গে দেখা করলাম।

ডাক্তার সাহেব আরো এক মাস ওষুধগুলো খেতে বললেন।

অবাক হলেও সত্য ছিল, এই তিনটি ওষুধের মধ্যে একটি ছিল মেয়েলি রোগের যেটা নাকি ওভারিতে ডিম্বাণু জন্মাতে সাহায্য করে। এটা আমি পরে জেনেছিলাম।

যাহোক আমার স্ত্রীর ঠোটের ফাকে হাসির ঝিলিক দেখতে পেলাম। আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হলো।

আমাদের পরিবারে হাসিখুশি জুড়ে এলো নতুন অতিথি জেরিন। জেরিন এখন স্কুলে যায়। এবার সে কেজিতে উঠবে। ফিরে আসি লেখার প্রথম দিকের কিছু কথায়। জেরিনকে স্কুলে ভর্তি করার পর থেকে আমার স্ত্রীর অনেক বান্ধবী হয়েছে। স্কুলের ভাবীরা, বৌদিরা, ক্লাসের টিচাররা আমার স্ত্রীকে বলতে থাকেন জেরিনের আম্মু, তোমার তো একটা বাচ্চা। আরেকটা নিয়ে নাও, আমরা তাকে বড় করে দেবো।

কিন্তু ভেতরের রহস্যটা কেউ জানতো না। ক্রমে আমার স্ত্রী অনেক ভাবীকে ট্যাবলেট খাওয়ার গোপন রহস্যটা বলে দেয়।

এবার আসি আগের কথায়। আর যায় কোথায়। নিলয়ের মা আমার স্ত্রীকে বলে, ভাবী, আমি সদর দরজা খুলে বসে আছি। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। নিলয়ের বাবা কোনো ডাক্তার দেখাতে চায় না। ভাইকে বলে আমাকে ওষুধ তিনটির নাম লিখে দেন। আমি তাকে এগুলো গুড়া করে চায়ের সঙ্গে খাওয়াবো।

আগেই বলেছি, ভদ্রলোক কোনো ডাক্তারের কাছে যেতে চান না। আবারও মনে পড়ছে একবার আমাকে ডাক্তার সাহেব অন্য একটি মেয়েলি রোগের ওষুধ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, সেটিও ওভারিতে ডিম্বাণু জন্মাতে সাহায্য করে।

এবার অন্য একটি কথা বলি। সেক্স বাড়াতে গোপনে আয়োজন করতে থাকি। গোপনে ডাক্তার দেখিয়ে ভিটামিন ইনজেকশন নিয়েছি। গেল জুনে আঠারো দিন সকাল বেলা খালি পেটে নির্দিষ্ট ইউনিটের ইনসুলিন নিয়েছি। তখন খাওয়ার সময় খুব খেতাম। কিন্তু এতে হয়েছে উল্টো সমস্যা।

আমার স্ত্রী জুলাই মাসে বলেছে, তার পিরিয়ড হচ্ছে না। চেষ্টা করেও তার পিরিয়ড আর হয় না। এক মাস পর ইউরিন টেস্ট করিয়ে দেখি পজিটিভ। প্রথম দিকে গড়িমসি করলেও পরবর্তীকালে ডাক্তার দেখিয়ে আমাদের অনাগত সন্তানকে স্বাগত জানানোর জন্য সব ব্যবস্থা নিচ্ছি। আমার স্ত্রী সুন্দর সুন্দর কাথা সেলাই করে সাজাচ্ছে তার আগমন বার্তা। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে এপৃলের প্রথমার্ধে সে আসছে।

*নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

## জানি না

– ইয়াসির আরাফাত

হঠাৎ পেছন দিক দিয়ে যেন কে ডাক দিল। হতবাক হয়ে ফিরে তাকালাম। দেখি সেই আমার প্রিয় মুখ।

আমাকে বললো, ইয়াসির, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করোনি কেন?

মাত্র আজ এসেছি রেশমি। আজ আমার জন্মদিন এ জন্য একটু তাড়াহুড়ো।

রেশমি বললো, আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

আচ্ছা, ঠিক আছে। রাত সাড়ে আটটায়।

আমার জীবনের স্মরণীয় দিন হলো ১ জানুয়ারি ২০০৩।

এদিনের শেষে রাত যখন নেমে এলো তখন রেশমিকে বললাম, আজ আমার উপহার কই?

রেশমি বললো, তোমার উপহার তোমার সামনে দাড়িয়ে।

আমার সমস্ত শরীর যেন শিহরণ দিয়ে উঠলো।

আমি তার ঠোটের সামনে গিয়ে তাকে বলি, রেশমি আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমার কাছে রেশমি সহজে হার মেনে যায়।

তাকে ভালোবাসতে শুরু করলাম। স্তব্ধ হয়ে দুজন দুজনকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলাম যেন আর ছাড়তে ইচ্ছা করছে না।

তাকে বললাম, রেশমি, আমাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরো।

এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে রেশমিকে বললাম, তোমাকে সাতটি বছর ধরে ভালোবেসে আসছি। কোনোদিন তুমি আমাকে বলোনি যে, তুমি আমাকে ভালোবাসো।

রেশমি লাজুক স্বরে বললো, শুনতে পেয়েছো?

বললাম, কই?

হাতের তালুতে মুখ লুকিয়ে রেশমি বললো, জানি না।

*ঢাকা থেকে*

# ব্যবধান

– মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম

এক নাগাড়ে কাজ এবং পড়ালেখা করতে যখন হাপিয়ে যাচ্ছি ঠিক তখনি এক সপ্তাহের ছুটি পেয়ে গেলাম। পূর্ব পরিকল্পনা এবং বন্ধুর নিমন্ত্রণ সব মিলিয়ে ভাবলাম এই ছুটিটা কানাডা-র টরন্টোতেই কাটাবো। আমি আমেরিকার মিশিগান স্টেট-এ থাকি। টরন্টো আমার থেকে মাত্র চার পাচ ঘণ্টার ড্রাইভ।

৪০১ ইস্ট হাইওয়ে-তে কিছুক্ষণ গাড়ি চালানোর পর দুই চোখ ভরে গেল রাস্তার দুই পাশের নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে। বিস্তীর্ণ মাঠ ভর্তি গম ক্ষেত, মাঝে মধ্যে ভুট্টা ক্ষেত। মাইলের পর মাইল এমন দৃশ্য বহুদিন দেখিনি। মনে পড়লো দেশের কথা – সবুজ মাঠ, কচি, ধান ক্ষেত, হলুদ সরষে ফুল। হায়! একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অজান্তেই।

হঠাৎ বাম পাশ দিয়ে একটা কালো ক্যাডিলাক শা করে ওভারটেক করলো। কালো সান গ্লাস পরিহিতা এই সুদর্শনা বেশ কিছুক্ষণ থেকেই আমার পেছনে পেছনে গাড়ি চালাচ্ছিল যা ব্যাকভিউ মিররে দেখছিলাম।

দেড়শ কিলোমিটার পর ম্যাকডোনাল্ডস-এ থামলাম খানিকটা বিরতি এবং গ্যাস নেয়ার জন্য। কফি নিয়ে টেবিলে বসার কিছুক্ষণ পরই পরীর চেয়েও সুন্দর, লম্বা, স্লিম একটি মেয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, হাই।

হাই বললাম আমিও।

আমি কি এই টেবিলে বসতে পারি? তার হাতে কফি।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। বলি আমি।

আমি এমিলিয়া। মিশিগান থেকে আসছি।

অবাক হয়ে বলি, সে তো আমিও!

আমি জানি। বলে সে।

কিভাবে? আশ্চর্য হই।

তোমার গাড়ির নাম্বার প্লেট দেখেই বুঝেছিলাম। তাছাড়া প্রায় আধঘণ্টা তোমার পেছনে পেছনে ড্রাইভ করছিলাম। কৌতূহল হচ্ছিল লোকটা কে? যে কি না আমারই স্টেট থেকে আসছে। বলতে পারো এটা এক ধরনের হোম সিকনেস। কিন্তু তুমি একশ বিশ কিলোমিটার ড্রাইভ করছিলে যা সর্বোচ্চ গতিসীমারও বিশ কিলোমিটার বেশি। সুতরাং পেছন থেকেই ভাবতে থাকলাম লোকটা কে, কি করে, বয়স কতো, কোথায় থাকে ইত্যাদি। মূলত এ রকম খামোখা চিন্তা করতে করতে সময় পার করছিলাম।

বাহ! বেশ মজার বুদ্ধি তো।

তারপর এক সময় তোমার গতি স্লো হয়। আর তখনই তোমায় ক্রস করি। দেখলাম তুমি মাঠের দিকে আনমনা হয়ে তাকিয়ে আছো। খুব সাধারণ একটা দৃশ্য। একটা যুবক আনমনা হয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছো। অথচ সেই সাধারণ দৃশ্যটাই আমার মনে গেথে রইলো। ভাবলাম নেক্সট সার্ভিস স্টেশনে থামবো আর এক কাপ কফি নেবো যদি ভাগ্যক্রমে তুমিও তা করো তবে তোমার সঙ্গে পরিচিত হবো। জানতে চাইবো কি ছিল। ওই মাঠে যা একটা তরুণীর চেয়েও আকর্ষণীয়। কারণ, আমার ধারণা ছিল, ওভারটেক করার পর তুমি আমায় ফলো করবে যা তুমি করোনি।

বললাম, আমি সুন্দরী মেয়েদের প্রতি নিরাসক্ত। মনে হলো তার অহংবোধে লাগলো।

কেন? তুমি কি শারীরিকভাবে অক্ষম? তীর ছুড়লো সে।

মনে হয় না, এ রকম কোনো প্রতিযোগিতা হলে কে জানে হয়তো প্রথমও হতে পারি।

সে বাকা চোখে চাইলো।

আরো বললাম, সুন্দরী মেয়েরা অবিশ্বাসী হয়।

প্রতারিত হওয়ার দলে তুমি প্রথম ছিলে না সেটা কি করে বিশ্বাস করি। সে খোচা দেয়।

আমি ভালোবাসিনি তাদের কাউকে কখনো। হয়তো সময় বা পদক্ষেপ কোনোটাই অনুকূলে ছিল না। তবে আমার বন্ধুরা যারাই ভালোবেসেছিল তারা সবাই হেরেছে।

তোমার দেশের সুন্দরীরা বোধহয় এ রকম।

তারপরও তারা এ দেশের মেয়েদের চেয়ে অনেক ভালো বলেই আমার ধারণা।

ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা কালো সিল্কি চুলগুলো নাড়িয়ে সে বললো, দুই একটা উদাহরণ সার্বজনীন হতে পারে না। বুঝলাম, এ পর্যায়ে তোমার অভিজ্ঞতা নার্সারি পর্যায়ে। এবার বলো কি ছিল ওই মাঠে?

আমার জন্মভূমি, আমার দেশ, হাজারো স্মৃতির রোমন্থন যা আমায় এলোমেলো করে দিচ্ছিল। ওটা কেবল মাঠ ছিল না। সেটা ছিল বিশাল এক প্রতিচ্ছবি।

আমি অত্যন্ত দুঃখিত, জানতাম না তুমি এভাবে ভাবছো...।

আমি মনে কিছু করিনি, এমন হতেই পারে।

আমাদের আলাপ জমে ওঠে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং কালচার নিয়ে।

আবার দেখা হবে এই বিদায়ে আমরা উঠি। পুরো রাস্তা তাকে ভাবলাম। দারুণ ফিগার, আকর্ষণীয় সৌন্দর্য আর চমৎকার কথাবার্তা, বিশাল বড়লোক, বাবা গাড়ির ডিলার, মা স্কুল শিক্ষিকা।

টরন্টো শহরটা আমাদের দুজনের জন্যেই নতুন। তবু যেদিকে ইচ্ছা সারা দিন ঘুরি আমরা। আমি দেশের গল্প করি, সে শোনে। বলি শীতের কুয়াশা ভেজা সকালের কথা, আশ্বিনের ঘন নীল আকাশ, ফাল্গুনের ঝরা পাতার গল্প, বাশ পাতার ফাক গলে নেমে আসা জোৎস্না রাতের কথা।

সে অদ্ভুত হয়ে শোনে, মাঝে মাঝে তার ঘন কালো চোখ দুটো আরো গভীর হয়ে ওঠে।

আমি অদ্ভুত ভালোলাগায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। মাত্র স্কুল পার হওয়া এই অসাধারণ সুন্দরী আমার হৃদয়ে শরতের কাশ ফুলের মতো দোলা দেয়।

আমরা মিউজিয়াম, সিএন টাওয়ার, লেক ওন্টারিও-র বিচে বলি হাজারও কথা। ডিনার শেষে তাকে নামিয়ে দিয়ে বন্ধুর বাসায় ফিরি। কখনো সে ড্রপ করে দিয়ে যায়। বুঝতে পারি আমাদের ভেতর কিছু একটা তোলপাড় করছে শুধু বলছি না কেউ।

পঞ্চম দিনে আমরা বিশ্ববিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে গেলাম। *হোটেল ম্যারিওট*-এর সামনে গাড়ি থামাতেই সে বেরিয়ে এলো। স্লিভলেস কালো গর্জিয়াস লম্বা টপস লেপ্টে আছে তার গোলাপি ফর্শা শরীরে। গ্লাস হিলের জুতার পুরোটাই কাচ রঙা। তার নগ্ন বাহু আর গোড়ালি থেকে গোলাপি আলোর বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো শরীর দুলিয়ে যখন আমার জিএমসি জিপ-এর দিকে এগিয়ে আসছিল তখন ফ্রন্ট লাউঞ্জে বসে থাকা বিশ পচিশজন নারী-পুরুষ তার দিকে হা হয়ে তাকিয়েছিল। পাচ ফিট ছয় ইঞ্চি উচ্চতার এমিলিয়া-র উচু সুডৌল বক্ষ আর ভারী নিতম্ব মিলে তাকে মনে হচ্ছিল যৌবন উপচানো বেহেশতের হুর যে কি না সদ্য পৃথিবীতে নেমে এসেছে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দিকে চেয়ে রইলাম।

গুড মর্নিং। সুন্দরী মেয়েদের দিকে এভাবে তাকাতে নেই।

সুন্দরের একটা সীমা আছে। কিন্তু এই সুন্দর অসহ্য। এবার বোধহয় আর নিরাসক্ত থাকতে পারবো না।

সে হাসলো। গুড, এটাই তোমার নিয়তি। তোমাকে এটা সহ্য করে যেতে হবে আজ এবং বাকি জীবন!

চমকে উঠি আমি। চঞ্চলতা বুকের মাঝে লুকিয়ে রেখে ভাবি এই বৈষম্যের কথা। আমরা দুজন কতো কাছে, অথচ আমাদের সমাজ কতো ভিন্ন, কতো পার্থক্য সংস্কৃতিতে! ভাবতে থাকি আর চুপচাপ কুইন এলিজাবেথ হাইওয়ে ধরে গাড়ি চালাতে থাকি।

আমায় ধাক্কা দেয় এমিলিয়া। তুমি এতো চুপচাপ কেন? আমায় আজ ভালো লাগছে না বুঝি?

তোমার অসহ্য সৌন্দর্য আমাকে চুপচাপ করে দিয়েছে। আমি বুঝতে পারছি এই রূপ আমায় টানছে পাগলের মতো, অথচ এই রূপ সুধা পান করতে পারছি না। আমার দূরদৃষ্টি আমায় থামিয়ে দিচ্ছে।

কেন? আমি তোমায় চাই এবং তুমি আমায়। এতে বাধা কিসের?

তোমার–আমার মধ্যে রয়েছে অনেক ব্যবধান। কালচার, সমাজ, রীতি–নীতি, ধর্ম, পোশাক, খাদ্য অনেক কিছু। জীবন আসলে অনেক কঠিন। দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির মিলন আসলেই অসাধ্য। আমার সমাজ, কালচার তোমার একেবারে অপরিচিত। সে জন্য তুমি অ্যাডভেঞ্চার অনুভব করছো, অথচ মিশিগানে গিয়ে তুমি ভুলে যাবে আমার মুখটাও!

সে দৃঢ় স্বরে বললো, আমার সিদ্ধান্ত চিন্তা প্রসূত। এ কয়েকদিনে তোমাকে নিয়ে অনেক ভেবেছি। একজন মানুষ হিসেবে তুমি চমৎকার। পুরুষ হিসেবে হ্যান্ডসাম এবং স্মার্ট। আর ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান–এ বায়োটেকনলজির একজন ছাত্রকে ট্যালেন্টেড বলবে না এমন বোকা আমেরিকায় আছে বলে আমার মনে হয় না। স্কুলে থাকতে আমার পেছনে শ শ ছেলেরা ঘুর ঘুর করতো। তাদের অনেকেই বিত্তবান ছিল। আমি তাদের সম্পদ দেখিনি, অনেকেই ছিল হ্যান্ডসাম। আমি তাদের সৌন্দর্য দেখিনি। আমি যা চাই তা তাদের ছিল না। এবং আমার মা বলেছিলেন, আঠারো হওয়ার আগে তুমি প্রেম বা সেক্স করো না। আমি সে কথা রেখেছি।

বললাম, নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সামনে দাড়িয়ে এই সুন্দর প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করে এটা বলা খুব সহজ। অথচ ভাবো তো, একই ঘরে তুমি–আমি দুজনে। একজন পছন্দ করি হট আর স্পাইসি রাইসকারি। অন্যজন...। আরো অনেক কিছু যা জন্ম এবং বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তুমি অর্জন করেছো যার অনেকগুলো তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।

সে বললো, দেখো, অভ্যাস বদলানো যায়। জীবনধারা বদলে যায় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে। আমি তোমায় ভালোবাসি, তোমার পেতে চাই আর তোমার হতে চাই। তোমাদের একই ওয়াইফ নিয়ে আমৃত্যু সংসার করাটা আমার ভীষণ পছন্দের।

বুঝতে পারছিলাম না কি করা উচিত কিংবা করি। কিন্তু তার আহ্বান উপেক্ষা করা ছিল আমার জন্য ভীষণ কঠিন। তার পাগল করা রূপ আমায় চুম্বকের মতো টানছিল এবং তার মানসিক দিকগুলো আমার মনে ভালোবাসার অংকুর ফোটাতে শুরু করছিল।

আমরা ফিরে এলাম টরন্টো–তে। কয়েকটা ইনডিয়ান দোকান ঘুরে তাকে বেশ এক জোড়া থৃ–পিস ও একটি শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট সেট কিনে দিলাম।

ডিনার শেষে তাকে ড্রপ করতে গেলে সে আমায় ছাড়লো না। বললো, যতোক্ষণ তুমি পাশে থাকো, সময়গুলো কেটে যায়। অথচ যখন একা থাকি তখন সময় কাটাতে হয়। তুমি আজ আমার সঙ্গে থাকবে। আমরা গল্প করে করে সারা রাত কাটিয়ে দেবো।

ড্রেস চেঞ্জ করে এমিলিয়া যখন আমার দেয়া গোলাপি সালোয়ার কামিজ পরে সামনে দাড়ালো তখন তাকে এতো সুন্দর লাগছিল যে, পলকহীন চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কৃশ্চিয়ান ডিওর–এর মাতাল করা হালকা ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়গুলোকে জাগিয়ে করে তুললো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার দুই বাহু ধরে রাখলাম। বললাম, কেন তুমি এই বিষ পান করাচ্ছো আমায়? আমি তো মরে যাবো আর তুমি নেক্সট উইকে ভুলে যাবে আমি তোমার জীবনে ছিলাম।

সে বললো, ভালোবাসা কোনো ক্লাইম্যাক্স স্টেজ নয়, বরং এটা একটা কনটিনিউয়াস প্রসেস যার নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। ভালোবাসা তোমার মতো এতো কিছু হিসাব করে হয় না। এই যে আমি তোমার জন্য বদলাচ্ছি, এটাকে কি তুমি কিছুই মনে করছো না? নেক্সট উইক কেন, নেক্সট লাইফেও আমি তোমাকে চাই, আমি তোমাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি তোমাকে...। বলেই সে আমার বুকে ঝাপিয়ে পড়লো।

জানি না কি হয়ে গেল। তাকে বুকে জড়িয়ে দিলাম আর তার নরম ঠোট দুটি গুজে দিল আমার ঠোটে।

অনেকক্ষণ পর চোখ খুললো সে।

একটু দাড়াও, বলে বাথরুমে গিয়ে ফিরে এলো আর আমি যেন ছাব্বিশ হাজার ভোল্টের শক খেলাম। এবার হালকা নাইটিতে তাকে কামনার বহ্নিশিখা মনে হচ্ছিল। আমেরিকায় আসার পর অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছি। কিন্তু এমিলিয়া-র মতো এতো ব্যালান্সড ফিগারের কোনো মেয়ে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। হালকা নাইটিতে তার প্রতিটি অঙ্গ দৃশ্যমাণ হচ্ছিল। মেদহীন টান টান পেট, অথচ ভরাট নিতম্ব। সুডৌল বক্ষ পাহাড়ের মতো খাড়া। কিন্তু নিঃশ্বাসের সঙ্গে কম্পমান।

কি হলো জানি না। শুধু এই জানি, আমরা ছিলাম উথাল-পাতাল। সারা রাত আমি ছিলাম বৃষ্টি ভেজা মাঠে লাঙল চালানো চাষী।

তার মুখ থেকে কথা বের হচ্ছিল অনর্গল, তুমি এ কোন জগতের সন্ধান দিলে আমায়, তুমি আমায় পাগল করে দিচ্ছ, আমি তোমার স্ত্রী হবো, আমি তোমার হবো চিরকালের জন্য।

আমরা আবার ফিরে আসি মিশিগানে। ফোন, দেখা হওয়া, লং ড্রাইভ-এ সময় যে কখন পেরিয়ে যায় বুঝতে পারি না। আমার ক্লাস শেষ হওয়ার আগেই সে পৌছে যায় ক্যাম্পাসে। অতঃপর আমরা লেক মিশিগান-এর পাড়ে বসি। মাঝে মধ্যে নাইট অফ কলম্বাস-এ প্রোগ্রাম দেখি। সালিমার-এ ডিনার আর গ্রস পয়েন্টিতে তার বাড়িতে তার উষ্ণ আবেশে লেক মিশিগান পেরিয়ে উদিত সূর্যের আলোয় চা পান করি।

সে ইতিমধ্যে বেশ কিছু রান্না-বান্না শিখেছে। তার বাড়ি এবং ব্যাংক মিলিয়ে প্রাপ্ত প্রায় পনেরো মিলিয়ন ডলার-এ আমাদের সিলেট শহরে কিভাবে জীবন যাপন করবে সে হিসাব করে সে।

তার হিসাব-নিকাশে দ্বিধান্বিত আমি ভাবি হাজারও কথা, ভাবি এর পরিণতি কি? সে নাহয় সব মেনে নিল। কিন্তু আমার পরিবার, সমাজ এটা কিভাবে নেবে? তাছাড়া এ ধরনের অসম সর্ম্পকগুলো শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে না যা এখানে আসার পর দেখেছি কয়েকটা ফ্যামিলির ক্ষেত্রে।

আমার মনে হয়, আমি আসলে তাকে ভালোবাসি না। আমি কেবল তার সৌন্দর্যে মোহগ্রস্ত। না হলে স্ত্রী হিসেবে তাকে গ্রহণ করতে আমার আপত্তি থাকবে কেন? বুঝতে পারি, আমার বুকের ভেতর যে রক্ত ধারা বহমান সে আমার বাংলাদেশের জীবনধারা। যতোই রূপে অন্ধ হই না কেন, আমার বুকের ভেতর বাস করে বাংলার নারী।

মাইনরগুলো প্রায় শেষ করে এনেছি। নেক্সট সেশনে মেজর শুরু করবো। এই দেড় বছরে অনেক কষ্ট করেছি কেবল অর্জনের জন্য। সুতরাং আমাকে ভুলে যেতে হবে সব। যদি কষ্ট হয় তবুও, বিশেষত যে সম্পর্কের কোনো সুখকর পরিণতির সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়।

এক বিকেলে সে আমার অফিসে এসে হাজির। আমার দেয়া নীল সালোয়ার কামিজে তাকে অপূর্ব লাগছিল। ব্যাকুল হয়ে সে জানতে চায়, আমি কেন দুদিন থেকে যোগাযোগ করছি না ইত্যাদি নানান প্রশ্ন।

সব বুঝিয়ে বললাম।

সে মানতে নারাজ। তবু তাকে বোঝাই আমাদের দেয়ালটা কোথায়। বলি, আবেগ আর সৌন্দর্যের কাছে হেরেছিলাম। সে ছিল সুখের হারা। কিন্তু বাস্তবতার কাছে আবার হারতে চাই না যে হারের কষ্ট আমায় পোড়াবে সারা জীবন। তারচেয়ে এই ভালো, ভুলে যাও স–ব, মনে করো কিছুই হয়নি।

তাকানো যাচ্ছিল না তার দিকে। পাথরের মতো শক্ত মুখখানা দেখে বুঝলাম ভাংচুর হচ্ছে।

তুমি কেবল বাইরেরটা দেখলে, আমার ভেতরটা দেখলে না। সবার কাছে আমি তোমার এতো প্রশংসা করেছি। এখন বুঝতে পারছি আমার ভাবনা কতো ভুল ছিল। আমি করুণা করে কারো ভালোবাসা পেতে চাই না। শুধু মনে রেখো, আমি তোমায় ভালোবেসেছিলাম এবং আমি তোমার ছিলাম।

ঝড়ের বেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

ঘরে এসে কিছুই ভালো লাগছিল না। টিভি অন করে এলোমেলোভাবে চ্যানেল পাল্টাছিলাম। কিছুই কানে যাচ্ছে না আমার। আমি বুঝতে পারছি আমার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। শূন্যতার কষ্ট, হারানোর কষ্ট। হায়...! কেন এমন হলো। উচ্ছল স্মৃতিগুলো আলুথালু করে দেয় আমি কি তার ছিলাম? হয়তো ছিলাম, হয়তো...।

*মিশিগান, ইউএসএ থেকে*

# অহঙ্কার

– মোহাম্মদ মিনার

প্রেম ভালোবাসা যদি সত্যিই পবিত্র হয় তাহলে নির্ঘাত আমার নিচের পাটির সামনের ত্যাড়া দাতটা শাহাদাতবরণ করেছে (ইন্নালিল্লাহি ওয়া...)।

সবেমাত্র এসএসসি পাস করে কলেজে পা দিয়েছি। গ্রাম থেকে আসা এই আমি, খাতা হাতে কলেজের সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে অহংকারে বুক ভরে যায়। শুধু আমি নই, নবাগত সকল ছাত্রছাত্রীদের দাপটে পুরনো বড় ভায়েরা আমাদের রাস্তা পরিষ্কার রাখতে বাধ্য হোন। ভাবটা যেন এমন, কলেজমে আ–গ্যায়া, অর কিসিকো পরোয়া নেহি।

যখন ক্লাস টেনে পড়তাম তখন গল্প শুনতে পেতাম, কলেজে নাকি স্যারদের কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই। তার মানে, তোমাকে ক্লাস করতেই হবে এমন কোনো শর্ত নেই। শুধু দরকার একটা প্রেমিকার, সেই সঙ্গে দুই টাকার বাদাম হলেই কলেজে আম বাগানের নিচে তার কোলে মাথা রেখে লাউ–লতিকার ডগার মতো দুটি হাতের দশ দশটি আঙুল তোমার চুলে বিলি কাটবে। আর শুধু তাতে যদি তোমার রোমান্টিকতা না আসে তাহলে সিগারেটটা ঠোট থেকে নামিয়ে পাঠা ছাগল যেমন ধাড়ি ছাগলের প্রস্রাব টেস্ট করে, অনুরূপ ঠোট দুটো একটু উপরে ওঠালেই তোমার প্রেমিকা বোবা কান্নার জবাব স্বরূপ তার লিপস্টিক লাগানো ঠোট দিয়ে তোমার ঠোটে পরশ বুলিয়ে তোমার ধন্য করবে। আহা! এরই নাম বুঝি কলেজ?

কাল্পনিক আনন্দে নিজেই নিজের কাছে কাতুকুতু খাই। মনে মনে দিন গুণি, মাত্র এক বছর। প্রেমিকা হিসেবেও ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরীকে সিলেক্ট করি। বাড়িতে পড়ার জন্য এখন আর আমাকে কারো বকুনি খেতে হয় না। রাত শেষ হয়। কিন্তু আমার পড়া শেষ হয় না। কলেজে আমাকে যেতেই হবে। কিছু হোক, না হোক অন্তত বিএসসি–স্যারের বেত্রাঘাত থেকে তো বাচা যাবে।

সেই ক্লাস টেন থেকে মিলির পিছে লেগে আছি। কলেজেও প্রায় তিন মাস কেটে গেল, এখনো পাত্তা পেলাম না। এর মাঝে অন্যদিকেও অবশ্য চেষ্টা কম করিনি।

একজন তো আমার ঘটককে বলেই দিয়েছে, মিনারভাই সব দিকে ফিট হলেও তার ত্যাড়া দাতটা বড় বেমানান। হাসি দিলে পুরো চেহারা বিকৃত হয়ে যায়, সুতরাং...।

বুঝতে পারলাম প্রেমিকারা সব ক্লোজআপ মার্কা হাসিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আমার বন্ধুরাও কতোবার বলেছে, দাতটা তুলে ফেলো।

এখন আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি আমার এ দাতের কারণেই আমাকে মিলি পছন্দ করে না। প্রতিজ্ঞা করলাম, দাত আমার তোলা চাই–ই চাই।

এরই মাঝে হঠাৎ করে কলেজ সংসদ নির্বাচন কাজ শুরু হলো। আপন দলের বড় ভাইয়েরা যেমন টানা হেচড়া শুরু করেছে তাতে মনে হলো, প্রত্যেকেরই ঘরে বোন আছে। তবে একজন শিবির কর্মী ভায়ের নম্র, ভদ্র আচরণে মুগ্ধ হলাম। শুরু হলো নিয়মিত তাদের মিটিং প্রোগ্রামে অংশ নেয়া।

খুব দ্রুত আমার আচরণে পরিবর্তন এলো। কখন যে পাচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া ধরেছি তা নিজেও টের পাইনি। আম বাগানে প্রচলিত প্রেমকেও মনে হলো নিষিদ্ধ প্রেম। এখন আর দাত পরিবর্তনের তেমন তাড়া নেই। বলা যায়, এখন আমি পুরো শিবির কর্মী। কিন্তু হঠাৎ করে মিলি সেদিন আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দিল কেন? তার কারণ হিসেবে মনোবিজ্ঞানীর মতো গবেষণা করতে গিয়ে মিলিকে যেন খুব বেশি ভালোবেসে ফেললাম। পরদিনই মিলিকে জানিয়ে দিলাম, তাকে ভালোবাসি এবং ভীষণ ভালোবাসি।

মিলি তার জবাবে বললো, আমি যেন দ্বিতীয়বার এ কথা মুখে না আনি।

আবার হতাশ হলাম। মনের আয়নায় সব সময় শুধু মিলির মুখ। এখন আর শিবির–টিবির কিছুই ভালো লাগছে না।

এক সময় বন্ধু সাদিকের সঙ্গে পরামর্শ নিলে সাদিক বললো, মেয়েদের পটাতে হলে আগে তাদের রূপের প্রশংসা করতে হয়। তুই বরং তার প্রত্যেক অঙ্গের প্রশংসা করে একটা চিঠি লেখ। সব শেষে লিখবি, তুমিই আমার বেচে থাকার একমাত্র প্রেরণা, আমায় ফিরিয়ে দিও না, প্লিজ!

হ্যা, আমিও ঠিক তাই করলাম। সাড়ে তিন পাতার এক প্রশংসাপত্র লিখে সাদিকের মাধ্যমে মিলি বরাবর হস্তান্তর করলাম।

এর তিন দিন পরই দেখছি হাসিমুখে মিলি আমার দিকে আসছে। ভেবে নিলাম একশ ভাগ কাজ হয়েছে। একেবারে মায়াবী কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছো মিলি?

ভালো। তবে এই মুহূর্তে বেশি কথা বলতে পারছি না, তুমি আগামী কাল সন্ধ্যার পর আমাদের বাসায় এসো, আমি একা থাকবো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

আমি আনন্দে গদ গদ। হাসিটা কোনো রকম চেপে বললাম, অবশ্যই আসবো।

এরপর সাদিককে বিস্তারিত জানালে সাদিক বললো, শালা, এবার তোর কোদাল মার্কা দাতটা তাড়াতাড়ি পাল্টা।

বুঝলাম, সাদিক যদি দেশের ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি হতো তাহলে অবশ্যই প্রেমের অনারারি ডিগ্রি পেতো।

সে যাক। যথাসময়ে মিলির দরজা নক করলাম। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। কিন্তু একি! এ আমি কি দেখছি? এ যে মিলির বড় ভাই। হতবাক হয়ে চট করে শিবির মার্কা সালাম দিলাম।

আর অমনি সালামের জবাব স্বরূপ আমার মুখের ওপর এক ঘুসির আওয়াজ পেলাম।

এক ঘুসিতেই আমি কুপোকাত। মুখ দিয়ে অনর্গল রক্ত ঝরতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর অনুভব করলাম আমার একটা দাত ঝরে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় মিলির ভাইও ভড়কে গেলেন।

তাকে আশ্বস্ত করলাম, এ কথা যদি তারা কাউকে না বলে তাহলে আমিও কিছু করবো না।

এ শর্তে তারা রাজি হলেন। অবশেষে আমার ফোলা মুখ নিয়ে বাড়ি গিয়ে বললাম, টিউবওয়েলের হ্যান্ডলে চোট লেগে দাত পড়ে গেছে।

যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। এবং অন্য দাতের সঙ্গে মিলিয়ে একটা কৃত্রিম দাত লাগানো হলো।

সত্যিই এখন নিজেরই হাসি আয়নাতে দেখতে বেশ ভালো লাগে। তবে প্রেম ভালোবাসার প্রতি এক অসম্ভব ভয় সব সময় নিজেকে সংযত করে লাখে। তবুও একদিন এক অপরূপ সুন্দরীর প্রেমের আহ্বানে না করতে পারিনি। সত্যিই সে এক অন্য রকম প্রেম, অন্য রকম ভালোবাসা যে ভালোবাসা তখন থেকে এখন পর্যন্ত আমাকে এবং আমার সন্তানদের মাঝে উদার চিত্তে বিলিয়ে দিচ্ছে, একটুও কার্পণ্য করে না। নিজেই নিজেকে ধন্য মনে করি।

কখনো বা ভাবি, খোদা যেন আমার সেই শহীদ দাতের মর্যাদা স্বরূপ আমায় এ সুখ দান করেছেন। কারণ, মিলিকে পবিত্র মনে ভালোবাসতাম। কিন্তু তার আত্মঅহংকারে আমার ভালোবাসা যে অপমানের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল তা আজ এই হ্যাপি ভ্যালেনটাইনস ডে-তে প্রকাশ করলাম।

পরিশেষে মিলিকে বলতে চাই, মিলি, তোমার সে অহংকার এখন কোথায়? আর কতোটা স্বামী পরিবর্তন করতে হবে তোমাকে? আয়নাতে একটু নিজেকে দেখো তো, গালের চামড়া কেমন হয়ে গেছে?

বলিষ্ঠ ভাই দিয়ে সেদিন এভাবে অপমান না করে অন্য উপায়েও আমায় প্রত্যাখ্যান করতে পারতে। আজকের এই ভালোবাসা দিবসে যে ভালোবাসা শুধু তোমাকে জানতাম তা এখন একমাত্র আমার মামণি প্রীতির আম্মুকে জানালাম।

*সাফাত, কুয়েত থেকে*

# প্রেমের বাগানে

– নয়ন খান

আমি তখন ডিগ্রিতে পড়ি। ১৯৯৯ সাল। ডিগ্রি পরীক্ষার্থী ছিলাম ২০০০ সালে। ছিলাম বাবা মায়ের বড় ছেলে। সংসার এবং আমাদের লেখাপড়ার খরচ মেটাতে বাবার একটু কষ্ট হতো। ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করেছি চাকরির জন্য। কিন্তু কোনো ফল পাইনি। টাকা দিয়ে আর্মির চাকরির জন্যও চেষ্টা করেছি। তাতেও ফল পাইনি। বাবাও আমাকে যে কোনো একটা কাজ করার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন।

ছিলাম তখন ছাত্র। বাবাকে লেখাপড়ার পাশাপাশি কৃষি কাজে সাহায্য করতাম। আমার ফুপাতো ভাই ছিলেন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ইনচার্জ। তার হাত ধরে চলে আসি ঢাকার মহাখালিতে এক গার্মেন্টস কম্পানিতে। চাকরি নিলাম কাটিং সেকশনে। ডিগ্রি পর্যন্ত পড়লে কি হবে? গার্মেন্টস সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। আমার সিনিয়রদের কথা মেনে চলতে হতো। এরা ছিল অল্প শিক্ষিত।

গার্মেন্টসে ছিল গালাগালি, লং টাইম ডিউটি এবং প্রেমের বাগান। এক মিনিট লেট হলে হাজিরা কার্ডে লাল কালির দাগ পড়তো। এমনি করে মাসের মধ্যে তিন দিন লেট হলেই একদিনের হাজিরা কেটে দিতো। সকাল আটটা বাজার আগেই উপস্থিত থাকতে হতো। ঢাকার মহাখালি এলাকায় ছয় মাস চাকরি করার পর চলে গেলাম টঙ্গিতে।

এখানে কিছুদিন চাকরি করার পর পরিচয় হলো সুমি নামের এক মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি একেবারে ফর্শা না হলেও শ্যামলার মধ্যে চেহারা ছিল ভালো। তার কথা, ভাব-ভঙ্গিমা ছিল অন্য রকম। আমি ছিলাম লাজুক স্বভাবের। আমার চেহারা ছিল ভালো। গায়ের রং ফর্শা, গোলগাল চেহারা, উচ্চতা সাড়ে পাচ ফিট।

আমি স্কুল-কলেজ পড়া অবস্থায় মেয়েদের সঙ্গে খুব বেশি মিশতাম না। কেননা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পেতাম। কিন্তু সেই সুমি নামের মেয়েটিকে এক দিন, দুই দিন দেখতে দেখতে ভালো লেগে যায় এবং তার প্রেমে পড়ে যাই। সে রোজ ড্রেস চেঞ্জ করে আসতো। প্রেমে পড়লে সকল প্রেমিক-প্রেমিকাই প্রসাধন

একটু বেশিই করে। সুমি ও আমার বেলায় ঠিক তাই হলো। গার্মেন্টস গার্লরা চায় একটা ছেলেকে কিভাবে হাত করা যায়। তবে সুমি ছিল সহজ, সরল মেয়ে।

তার কাছে আমার সকল কথাই বলতাম। সেও আমাকে সব কিছু খুলে বলতো।

এভাবে অনেক দিন চলতে থাকে। তারপর সে এই কম্পানি ছেড়ে অন্য কম্পানিতে চলে যায়। সে থাকা অবস্থায়ই আমাকে হেলেনা নামে আরো একজন মেয়ে প্রেমের অফার দেয়। সে ছিল সুন্দরী। আমি তার প্রস্তাবে হ্যা না কিছুই বলিনি। এর কিছুদিন পর রমজানের ঈদ। অন্য এক মেয়ের হাতে আমাকে একটি উন্নত মানের ঈদ কার্ড সে পাঠায়। আমি প্রথমে কার্ডটি নিতে চাইনি। শেষ পর্যন্ত নিতে হলো।

এভাবে তার সঙ্গেও প্রেমে জড়িয়ে গেলাম। কিছুদিন কেটে যাবার পর সে আমাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

তার প্রস্তাবে রাজি হইনি। তাকে বলেছিলাম, যদি ভালোবাসো তাহলে আমাকে সময় দিতে হবে।

সে শুধু আমাকে বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লাগলো। আর রোজ পোশাক পরিবর্তন চললো। কোনোদিন লাল শাড়ি, কোনোদিন নীল শাড়ি, কোনোদিন থ্ পিস আবার কোনোদিন জর্জেট এবং বিভিন্ন ধরনের ওড়না ব্যবহার করতো। তার ইচ্ছা ছিল আমাকে তার রূপের ফাদে ফেলবে। এক পর্যায়ে হেলেনা আমাদের গার্মেন্টস ছেড়ে অন্য গার্মেন্টেসে চলে যায়।

এরপর ঈদের ছুটিতে বাড়ি গিয়ে সমবয়সী বন্ধুদের কাছে বললাম, ভাবীদেরকেও বললাম। তারা শুনে সবাই অবাক। যে আমি পারতপক্ষে কারো সঙ্গে কথা বলি না সেই আমি প্রেম করছি!

আমাদের বংশ হলো খাঁ বংশ। গ্রামের নামকরা বাড়ি। আমাদের এলাকায় গার্মেন্টসের চাকরি হলো ঘৃণার যোগ্য। কেউ এই চাকরি পছন্দ করতো না। এক কালে আমারও গার্মেন্টেসের মেয়েদের বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না।

বাবা তো শুনেই মাথায় হাত। সমাজের কাছে মানসম্মান যাবে। মোটকথা, এ বিয়েতে তিনি রাজি নন। বাবা পরিষ্কার বলে দিলেন, যদি এ বিয়ে করো তাহলে আমাদের হারাবে।

পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনদের কথা মনে করে পিছিয়ে পড়লাম। সুমি ও হেলেনা দুজনই দুই কম্পানিতে চলে যাওয়ায় বেশি একটা দেখা-সাক্ষাৎ হতো না। আমিও দেখা করার চেষ্টা করতাম না। কারণ, বিয়ে যেহেতু করা যাবে না, দেখা করে ভালোবাসার ভণিতা বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তারপরও মাঝে মধ্যে সময় ঠিক করে আলাপ করতাম।

গার্মেন্টসে যারা চাকরি করেন তাদের পোস্ট এবং বেতন সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। গার্মেন্টস শ্রমিক যারা তাদের তেমন লেখাপড়ার দরকার হয় না। কাজে দক্ষ হলেই অনায়াসে চাকরি। অপারেটর হলে আঠারশ থেকে তিন হাজার, সুইং হেলপার ছয়শ থেকে নয়শ, সুইং আয়রনম্যান নয়শ থেকে ষোলশ, ফিনিশিং হেলপার নয়শ থেকে আঠারশ, ফিনিশিং আয়রনম্যান পনেরোশ থেকে দুই হাজার দুইশ, কাটিং হেলপার চোদ্দশ থেকে আঠারশ, কোয়ালিটি আঠারশ থেকে দুই হাজার আটশ, সুপারভাইজার তিন হাজার দুইশ থেকে ছয় হাজার, মার্কারম্যান তিন হাজার থেকে সাত হাজার, কাটারম্যান আড়াই হাজার থেকে চার হাজার, লাইন চিফ ইনচার্জ ছয় হাজার থেকে দশ হাজার, কন্ট্রোলার আট হাজার থেকে ষোল হাজার, পিএম ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা বেতন। এরা সবাই ফ্লোরে কাজ করে বেতন নেন। অফিসে বসে থেকে নয়।

সুপারভাইজার, লাইন চিফ ইনচার্জ, কন্ট্রোলার এদের মধ্যে অনেকেরই সার্টিফিকেটের জোর কম। কাজের বদৌলতে টাকার অংক বেশ ভালো। আর যারা সরকারি চাকরি অথবা প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে এসেছেন, ডিগ্রি অনার্স, মাস্টার্স করে এসেছেন তারা বেতন পান চার হাজার থেকে ছয় হাজার টাকা। আমার

মতে, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ শিখতে পারলে অল্প লেখাপড়ায় বেতনের দিক দিয়ে অনেক ভালো বলা যেতে পারে।

গার্মেন্টস কম্পানি ছেড়ে দেয়ার দীর্ঘ এক বছর পর আমি নতুন করে আবার এই গার্মেন্টসে চাকরি নিলাম।

এক মেয়ে আমাকে দেখা মাত্রই বলে ফেললো, নতুন মালের আমদানি হয়েছে।

আমাকে আমার অজান্তে অনেক মেয়েই ভালোবাসতো। আমি সেটা বুঝতে পারতাম। কিছুদিন যেতে না যেতে রোজিনা নামে সুন্দরী এক অপারেটর আমাকে সরাসরি ভালোবাসার কথা বললো।

বন্ধুরা অনেকে উৎসাহ দিতো, তোমার সঙ্গে রোজিনাকে মানাবে।

অন্যদের কাছে থেকে সে আমার মতামত নিতে চাইলে আমি বলতাম, আপন করে ঘর বাধতে না পারলে প্রেম করে কি লাভ?

সে বললো, আমাকে বিয়ে করতে হবে না। আপনাকে আমার ভালো লাগে। বিয়ে ছাড়াই আমি প্রেমের জন্য রাজি।

এমনি করে আমার অজানায় অনেক মেয়ে আমাকে ভালোবেসেছে। শেষ পর্যন্ত সবার সঙ্গেই মিশতাম। সবাইকে বলতাম ভালোবাসি। তবে সেটা ছিল মুখে মুখে।

এদের মধ্যে প্রথমে সুমি, দ্বিতীয় হেলেনা, তৃতীয় রোজিনা। এ তিনটি মেয়েকে কোনোদিনও ভুলতে পারবো না। এরাও আমাকে ভুলবে না। এদেরকে আজও ভালোবাসি। আমি এখন গার্মেন্টসের চাকরি ছেড়ে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছি।

সুমি নামের মেয়েটি ছিল আমার প্রথম ভালোবাসা। সে আমার অপেক্ষায় এখনো কাদে। তার বয়স প্রায় বিশ। সে আমার জন্য কোনো পাত্র পছন্দ করে না। সে আমার সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা করে। ফোনের মাধ্যমেও দুজনের কথাবার্তা হয়।

তাকে সরাসরি বলে দিয়েছি, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা আমার সমাজ তোমাকে মেনে নেবে না।

সুমির আম্মা আমাকে অনেক স্নেহ করেন। সে জন্য তাদের বাসায় এখনো আসা-যাওয়া করি। সুমিকে আজও ভালোবাসি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকেই মনে রাখবো। সুমি, আমাকে ক্ষমা করে দিও। তোমার মা তোমার জন্য যে বিয়ে ঠিক করেন তাতে রাজি হয়ে যাও। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি।

১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে সুমি, হেলেনা, রোজিনা-র প্রতি রইলো আমার অফুরন্ত ভালোবাসা। আমার ভালোবাসা এদের দেহ ভোগ করার জন্য নয়। আমার ভালোবাসা ছিল প্রকৃত মনে-প্রাণে ভালোবাসা।

*ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা থেকে*

## প্রিয়তমাষু

সেনাবাহিনীর অফিসারদের সম্পর্কে সিভিল সমাজের ধারণাগুলো বেশ অদ্ভুত। অনেকের কাছে এরা হৃদয়হীন যন্ত্র ছাড়া আর কিছু না। কেউ বা মনে করেন, এরা সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী। আবার কেউ বা এদেরকে দেবতুল্য মনে করেন। ভাবেন, জনগণের শেষ আশ্রয়স্থল তারা। মিডিয়া ও টেলিভিশনে এদের চেহারা দেখে অনেকের মনে হয়, এরা খুব রুক্ষ ও একঘেয়ে জীবনের লোক। অনেকেই যখন বলেন, আপনারা খুব রাগি, তাই না? তখন একটুও অবাক হই না, বরং হাসি। মানুষ সব সময় একটা কথা ভুলে যায় আর সেটা হলো, প্রতিটা মানুষের ব্যবহার ও চরিত্র গড়ে ওঠে তার পরিবেশ-পরিস্থিতি, নিজস্ব ব্যক্তিত্বের ওপর, প্রতিষ্ঠান এখানে অন্যতম একটি ফ্যাক্টর মাত্র।

আজ থেকে পাচ বছর আগের ঘটনা। তখন ক্যাপটেন ছিলাম। পোস্টিং ছিল সৌন্দর্যের শহর রাঙামাটিতে। নির্দিষ্ট ছকে বাধা কিছু কাজ আর অগ্রবর্তী ঘাটি পরিদর্শন এই ছিল আমার কাজ। প্রায়ই হাটতে হাটতে চলে যেতাম কাপ্তাই লেকের কাছে। এতো সুন্দর পরিবেশ জীবনে কখনো দেখিনি। নিত্যনতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতো, বিশেষ করে পর্যটকদের সঙ্গে। সত্যিই কি চমৎকারই না ছিল দিনগুলো!

হঠাৎ একদিন দেখা হলো তার সঙ্গে। স্নিগ্ধ, শ্যামলা মুখ। অদ্ভুত মায়াবী চেহারা। চোখে–মুখে খুব উদাস একটা ভাব। অব্যক্ত বেদনার চিহ্ন তার মুখে।

অবাক হয়ে লক্ষ্য করতাম, অদ্ভুতভাবে মেয়েটা হাটতো যেন সে ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু নেই। খুব নিঃসঙ্গ মনে হতো তাকে। একটি পরিবারের সঙ্গেই সে আসতো।

একদিন যেচে পরিচিত হলাম তাদের সঙ্গে। ভদ্রলোক সরকারি কর্মকর্তা আর মেয়েটা তার শ্যালিকা। নাম শিশির। সুন্দর একটি নাম।

তাদের সবার বাড়ি কুমিল্লা শহরে। মেয়েটি কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়তো। মেয়েটি এতো চুপচাপ, উদাসীন কেন সে কথা জানতে চাইলে ভদ্রলোক তার স্ত্রীর সঙ্গে মুখ চাওয়াচায়ি করলেন। বললেন, পরে এক সময় বলবো।

এভাবে প্রায়ই দেখা হতে লাগলো তাদের সঙ্গে। তাদের সরকারি স্টাফ কোয়ার্টারেও গেলাম। কিন্তু শিশির একদম নিশ্চুপ। কোনো কথাই নেই তার। একদিন জোর করে তার সঙ্গে কথা বললাম। কি মধুর তার কণ্ঠস্বর। কিন্তু সে তেমন কোনো কথাই বললো না।

এরপর মরিয়া হয়ে গেলাম তার সঙ্গে কথা বলার জন্য। আমার আচরণে এক সময় সে বাধ্য হলো আমার সঙ্গে কথা বলতে।

ধীরে ধীরে বুঝলাম, আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি।

আমার প্রথম প্রেম! পৃথিবীর সবচেয়ে মধুরতম অনুভূতি এটা।

ধীরে ধীরে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগলো। তাকে পাওয়ার জন্য আমি হন্যে হয়ে উঠলাম। কাজ–কর্মে ভুল হতে লাগলো। লেফটেনান্ট কর্নেলস্যার দুই একদিন ধমকও দিলেন।

এরপর আমার পক্ষে আর চুপচাপ করে থাকা সম্ভব হলো না। সরাসরি তার বোনের কাছে গিয়ে বললাম যে, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।

তিনি খুব অবাক হলেন। বললেন, তার সব কথা তুমি জানো না। তাই এ রকম বলছো। সব জানলে আর বিয়ে করতে চাইবে না।

বলেন। আমি তার সব কিছু জানতে চাই।

এরপর আপা উচ্চারণ করলেন পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম সত্যটি।

শিশির একটি ধর্ষিতা মেয়ে।

বর্ষা ভেজা একদিন কলেজ থেকে বাসায় ফেরার পথে ঘটনাটি ঘটে। তারপর সব জানাজানি হওয়ার পর পরিবারের মুখ রক্ষায় তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে তার বোনের কাছে রাঙামাটিতে। এরপর থেকেই সে কোনো কথা বলে না। চুপচাপ এবং উদাসীন।

চমকে উঠলাম। আমার সমগ্র পৃথিবী দুলে উঠলো। ব্যথিত চিত্তে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। সারা রাত চিন্তা করলাম শিশির সম্পর্কে। কি অদ্ভুত আমাদের সমাজ। একজন ধর্ষকের সাজা হয় না, অথচ এতো চমৎকার একটা মেয়ে বাধ্য হলো তার প্রিয় কলেজ, পরিচিতজন ছেড়ে এতো দূরে চলে আসতে। আর সবচেয়ে লজ্জার বিষয়, শিশিরের আত্মীয়স্বজন নাকি এ নিয়ে কুৎসা রটনা করেছিল।

সারা রাত ধরে যুদ্ধ চললো আমার মনে। একদিকে রক্ষণশীল বাঙালি মুসলিম সমাজে বেড়ে ওঠার মানসিকতা, অন্যদিকে ভালোবাসা।

শেষ পর্যন্ত ভালোবাসারই জয় হলো। একটা ধর্ষিতা মেয়ের তো কোনো দোষ নেই। সে তো এর ভিকটিম মাত্র। তার শারীরিক পবিত্রতা হয়তো বা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু তার মানসিক পবিত্রতা তো এখনো অটুট।

পরদিন সকালে গেলাম আবার। আপাকে বললাম, আমি শিশিরকে মেনে নিতে প্রস্তুত।

আপা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে কেদে উঠলেন। শিশিরকে জানানোর পর সে অদ্ভুত হয়ে চেয়ে রইলো আমার দিকে। চোখের কোণে চিকচিক করে উঠলো জল।

এরপর কিছুদিন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। ডিউটিতে গহীন জঙ্গলে ছিলাম অস্ত্র উদ্ধারের জন্য। ক্যাম্পে ফিরে এলে ব্যাটম্যান বললো, একজন মহিলা এসেছিলেন আমাকে একটা চিঠি দিতে।

চিঠিটা শিশিরের লেখা।

চিঠিটা পড়ে হতবাক হয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। শিশির চিঠিতে লিখেছে –

*প্রথম যখন তোমাকে দেখেছিলাম তখনই বুঝেছিলাম খুব অসাধারণ একজন মানুষ তুমি। তোমার মতো স্বামী পাওয়া যে কোনো মেয়ের জন্যই খুব সৌভাগ্যের। কিন্তু তোমার আর আমার দুটি পথই আলাদা। তুমি খুব মেধাবী একজন অফিসার। একদিন তুমি জেনারেল, আল্লাহ চান কি সেনাপ্রধানও হয়তো হবে। তোমার পাশে আমার মতো নষ্টা একটা মেয়েকে মানায় না। আমার এ চিঠি পেয়ে ভেঙে পড়ো না। খুব সুন্দরী অনেক ভালো মেয়ে আসবে তোমার জীবনে। ভালো থেকো, সুখে থেকো।*

সত্যিই শিশির আমাকে ছেড়ে চলে গেল। তার আপার কাছে জানলাম একটি এনজিওতে চাকরি নিয়ে চলে গেছে ঢাকার আশপাশে কোথাও। এনজিওটির কাজ নির্যাতিতা মেয়েদের সাহায্য করা।

একরাশ ব্যথা বুকে নিয়ে ফিরে এলাম ক্যাম্পে। নিজের পদবি, নিজের পেশা সব ভুলে গিয়ে সারা রাত কাদলাম। নিজেকে কখনো এতোটা অসহায় মনে হয়নি।

এরপর চলে গেলাম জাতিসংঘ মিশনে। দীর্ঘ দিন পর দেশে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে পদোন্নতি পেয়ে মেজরও হয়েছি।

*অপারেশন ক্লিন হার্ট*–এর সময় ঢাকায় ছিলাম। সারা শহর মিলিটারি জিপে ঘুরে বেরিয়ে শুধু খুজেছি সেই প্রিয় মুখ। কিন্তু পাইনি তাকে। আজও হৃদয়ে একরাশ বেদনা, এক রাশ যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছি।

প্রিয়তমাষু, কেন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে। তুমি ধর্ষিতা ছিলে তাতে কি হয়েছে? এর জন্য তো তুমি দায়ী নও। আমার জীবন শূন্য করে হলেও আমি চেয়েছিলাম তোমাকে পূর্ণ করে পেতে। বলো, আমার কি অপরাধ ছিল? মা খুব করে ধরেছে বিয়ের জন্য। খুলনা শহরের হর্তা–কর্তা আমরা। আমার এক মামা এমপি এবং দূরসম্পর্কের এক মামা মন্ত্রী। কতো বড় বড় জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছে। কিন্তু বড়লোকের এসব মাকাল ফল মার্কা মেয়ে কি পারবে তোমার শূন্যস্থান পূরণ করতে? জানি না, জানতেও চাই না।

*নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক*

## চন্দ্রা

– সুজন চৌধুরী

চার বছর ধরে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে পড়ি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কাউকে পছন্দ করতে পারলাম না। কারণ হিন্দু মেয়ের সংখ্যা আমার ক্লাসে মাত্র একটি। আমিও হিন্দু।

এভাবেই এসএসসি পাস করার পর অনেক আশা নিয়ে থাকলাম যে এবার কলেজে অবশ্যই কোনো ভালো অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে পাবো। সত্যিই বেশ কিছু মেয়ে বীরগঞ্জ থেকে ভর্তি হলো। কলেজের ফার্স্ট ইয়ার কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। সেকেন্ড ইয়ারে শুরু হলো প্রেমের তাড়না। মল্লিকা নামের মেয়েটিকে নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হই হুল্লোড় শুরু করলাম। হঠাৎ জানতে পারলাম সে তপু নামের ছেলের বুকিংয়ে রয়েছে। তাই অল্প একটু হতাশা নিয়ে শুরু করলাম চন্দ্রাকে নিয়ে হই হুল্লোড়।

আশ্চর্য ব্যাপার, এক সময় লক্ষ্য করলাম, আমি তার প্রতি প্রচণ্ডভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছি। তাকে শুনিয়ে অনেক কথা বলতাম ও বোঝানোর চেষ্টা করতাম তাকে পছন্দ করি। একদিন মেসের ছেলেদের দিয়ে প্রস্তাবও দিলাম। কিন্তু সে হ্যা না কিছুই বলেনি। তবে তার চোখ দুটো এতোই সুন্দর ছিল যে, হারিয়ে যেতাম সে চোখে। তার চোখের ভাষায় বুঝলাম সেও আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে। এভাবে যখন আমার বুকে প্রেমের ঝড় চলছে তখনই অন্য এক ছেলের প্রস্তাবে সে তাকে জানালো তার সম্পর্ক আছে প্রিতমের সঙ্গে।

সেই ছেলে তো ঠিকই থাকলো। কিন্তু আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এলো। যদিও জানি না কে প্রিতম তবু অবাক হলাম আমার ধারণা এতোটাই ভুল। তার সেই চোখে যা দেখেছি তা পুরো হলো না। মন ভেঙে কয় টুকরো হলো গুণতে পারলাম না। বুঝলাম মেয়েদের মন সত্যিই বোঝা দুঃসাধ্য।

সামনে টেস্ট পরীক্ষা। তবু পড়ায় মন বসাতে পারছি না। কয়েকদিন আগেই যে চিঠিটা লিখেছিলাম আঙ্গুল কেটে রক্ত দিয়ে তা আর দিতে পারলাম না। অবশেষে পরীক্ষা শুরু হলো, শেষও হলো। পরীক্ষা খুব একটা ভালো না হলেও পাস করবো। এটাই এই অবস্থায় বিরাট পাওয়া।

প্রতিটি পরীক্ষা শেষে তাকে দেখেছি ভালোভাবে। বিশ্বাস করতে পারি না, এ মেয়ে অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারে! তার চোখে আজও কোনো পরিবর্তন খুজে পাই না। মনেই হয় না সে প্রিতমের। শেষ পরীক্ষার শেষে কলেজের তিন তলায় দাড়িয়ে দেখছি সে তার বান্ধবীদের সঙ্গে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে। তার এক বান্ধবী ইশারায় তাকে আমার কথা বললো। সে আমাকে দেখেই এমন এক হাসি দিল যা আমার কেন যে কোনো আঠারো বছরের ছেলের বুকেই ঝড় তুলতে সক্ষম। আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলাম।

দুই তলা পেরিয়ে সে আমার কাছে এসে আমার একটা হাতে হাত রেখে বললো, সুজন, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, তাহলে প্রিতম?

সে মুচকি হেসে বললো, তুমিই তো প্রিতম, তোমারই ছদ্ম নাম আমরা রেখেছি প্রিতম।

চন্দ্রা আকাশের চাদ হয়ে আমার হাতে এলো। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আই লাভ ইউ। আই লাভ ইউ, চন্দ্রা। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলাম তাকে।

*পার্বতীপুর, দিনাজপুর থেকে*

## টেস্ট ম্যাচ

– সাকিব

প্রিয়া, পত্রের শুরুতে এক ওভার–এ ছয়টি বাউন্ডারিসহ ছত্রিশ–এর প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। আশা করি নতুন প্লেয়ারকে নিয়ে চমৎকার কৃকেট খেলে দিনগুলো উপভোগ করছো। টস–এ জয়লাভ করে ওয়ানডে–তে জিতে তোমাকে নিয়ে রমনা বটমূলে অথবা সংসদ ভবনের খোলা মাঠে ফিল্ডিং করার চিন্তা–ভাবনা চলছে এবং তোমাকে সঙ্গে নিয়ে একটি পর একটি ফোর–সিক্স মেরে দ্রুত সেঞ্চুরি করার স্বপ্ন দেখছি।

নো বল, লেগ বাই বিহীন আমাদের এই ভালোবাসার জীবন নট আউট রেখে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে তোমার ভালোবাসার মায়াবী লেগ ব্রেক, কমোন গুগলি স্পিন, আবার কমোন ১৮০ মাইল বেগে ফার্স্ট বল দিয়ে আমার ভালোবাসার উইকেট গুড়িয়ে দিয়েছো বোল্ড করে। সে জন্যই আমি যেন আর ব্যাট-এ বল সংযোগ করতে পারছি না। স্মৃতিগুলো কেবলই ইন সুইং এবং আউট সুইং হয়ে বার বার আমার হৃদয়ে ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ড-এ ভেসে উঠছে। কিন্তু একবারও কি ভেবেছো ম্যাচ ফিক্সিং এবং বল ট্যামপারিংয়ের মিথ্যা অপবাদে আমাকে তোমার মাঠ থেকে বের করে দিয়েছো?

আমি ইচ্ছা করলে নালিশ করতে পারতাম আইসিসি-তে। কিন্তু না। তুমি একবারও চিন্তা করলে না। আমি তোমার ছিলাম স্ট্রাইক বোলার এবং ওপেনিং ব্যাটসম্যান। তাই ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলো হয়ে তুমি আমার মাঠ-এর কৃজে ফিরে এসো। এখন দেখে নিও কোনো প্রকার স্টাম্পিং, এল.বি.ডাবলিউ, কট বিহাইন্ড বা রান আউট না হওয়ার ১০০% নিশ্চয়তা দিচ্ছি। তোমাকে নিয়ে আমার শেষ ভালোবাসার মাঠে তিন দিনের একটি টেস্ট ম্যাচ-এ নট আউট ইনিংস উপহার দেয়ার আশায় তোমার আম্পায়ার মা ও ম্যাচ রেফারি আব্বাজানকে পেপসি-র অভিনন্দন জানাই।

ইনজুরির কারণে আর বেশি কিছু লিখতে পারলাম না। কিন্তু ইনজুরি থেকে ভালো হলে আবারও দেখা হবে এক রাতের টেস্ট ম্যাচ-এ।

*মিরপুর, ঢাকা থেকে*

## লাভ ইন সামোয়া

– মোহাম্মদ নাসিমুল ইসলাম

নাম তার সান্তু। বয়স ছয় ছুই ছুই করছে। স্কুল শেষে নির্দিষ্ট স্থানে সে দাড়ায়। তার প্রতি এটা আমার নির্দেশ। লাঞ্চের বিরতিতে প্রতিদিন গাড়িটা থামাই তার অতি কাছে। বাড়ি ফিরি দুজনে এক সঙ্গে। গাড়িতে দশ মিনিটের পথ। সময়টা গল্প করেই কাটাই।

প্রতিদিনের মতো একদিন গাড়ি থামালাম তার নির্দিষ্ট স্থানে। লক্ষ্য করলাম, সান্তুর সমবয়সী একটি মেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললো, হাই! মাই ডিয়ার।

সান্তু তো হেসে কুটি কুটি।

মেয়েটির নাম কি? গাড়িতে বসতেই জিজ্ঞাসা করলাম।

সিসিলিয়া।

তোমাকে জড়িয়ে ধরলো কেন?

মনে হয় আমাকে ভালোবাসে।

তুমি ভালোবাসো না?

না।

অন্য কাউকে ভালোবাসো?

হ্যা।

কি নাম সে মেয়ের?

জেসমিন।

ভালোলাগে কেন?

আম্মুর নামে নাম তাই।

আমি তখন সামোয়া–র ইউএনডিপি–তে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত। স্ত্রী জাপানে উচ্চ শিক্ষারত থাকায় দুই ছেলে আর এক কাজের মেয়েকে নিয়েই আমার সংসার।

সান্তু আমার ছোট ছেলে।

তার মুখে তার ভালোবাসার কথা আমার সাময়িক একাকীত্বে একটি আনন্দের উপাদান হিসেবে বিবেচিত হলো।

আমার অনুরোধে পরদিনই জেসমিনকে দেখিয়ে দেয় আমাদের পুচকে প্রেমিক। ছোট এক বারবিডল গড়নের জেসমিন তখন তার মায়ের হাত ধরে পার্কিং এলাকায় যাচ্ছিল। লক্ষ্য করলাম তার মা আমার পূর্ব পরিচিতা। ব্যাংকে কাজ করেন। ব্যাংকে একাধিকবার তার সঙ্গে কথা হয়েছে। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই উপযাচক হয়ে এগিয়ে গেলাম, কথা বললাম। জেসমিনকে কোলে তুলে আদর করলাম। আমাদের বাসায় বেড়াতে আসতে বললাম।

জেসমিন ফুটফুটে এক মেয়ে। মুখের কোথায় যেন একটি তিল রয়েছে যা তার সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ইদুরের মতো ছোট ছোট দুধেল দাত। ইংরেজিও ভালোই বলে। অনুমিত হলো সে হবে ভবিষ্যতের মিস সামোয়া। মনে মনে তারিফ করলাম সান্তুর পছন্দের। আমার স্বাভাবিক ও সহজ আচরণে সান্তুও আমার কাছে অবলীলায় তার মনোভাব প্রকাশ করতো।

একদিন বাসায় ফেরার পথে সান্তুকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ভালোবাসার কথা কি জেসমিন জানে?

না।

তুমি তাকে বলতে পারো না?

আমার লজ্জা লাগে।

এভাবে তো লাভ হবে না। তোমাকে ভালোবাসার কথা বলতে হবে। *আই লাভ ইউ* বলতে হবে।

আমার লজ্জা লাগে।

ক্লাসে কি সে তোমার দিকে তাকায়?

হ্যা। প্রতিদিন তিন–চার বার।

তুমি তাকে যেদিন তোমার ভালোবাসার কথা বলতে পারবে সেদিন তোমাকে ম্যাকডোনাল্ডসে খাওয়াবো।

এভাবে বেশ কিছুদিন চললো। সান্তুর ভালোবাসা তাকাতাকির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো।

হঠাৎ করে একদিন লক্ষ্য করলাম, আমার পুচকে প্রেমিক পুত্র মহাখুশি। গাড়িতে উঠেই সে বললো, আব্বু, আজ ম্যাকডোনাল্ডসে চলো।

ভাবলাম সর্বনাশ! নালিশ বুঝি আজকেই এলো। গাড়ি ম্যাকডোনাল্ডসের দিকে চলার পথে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ জেসমিনের সঙ্গে কথা হয়েছে?

হ্যা।

কি কথা বলেছো?

সে আমাকে এসে বললো, ডু ইউ হ্যাভ ইরেজার?

তুমি কি বলেছো?

নো।

মেয়েটি ইরেজার অর্থাৎ রাবার চেয়েছিল। সান্তু বলেছে তার কাছে রাবার নেই।

আমি ভাষা হারিয়ে ফেললাম। ম্যাকডোনাল্ডসের পরিবর্তে সেদিন অন্যত্রই নিয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম তাকে দিয়ে আর ভালোবাসা হবে না।

**দুই.**

আগেই বলেছি, সামোয়ার ইউএনডিপিতে কর্মরত ছিলাম। সেই সুবাদে আমার বাসস্থানটি ছিল অতি সম্ভ্রান্ত আবাসিক এলাকায়। বাসার সামনের রাস্তা পার হলেই ছিল রাষ্ট্রপ্রধানের সরকারি বাসভবন, দক্ষিণের বাসাটি ছিল উপরাষ্ট্রপতির ভবন আর পেছনের অর্থাৎ পশ্চিমের বাসাটি ছিল পররাষ্ট্র সচিবের। প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে সকলের সঙ্গেই ছিল আমার আন্তরিক সম্পর্ক।

এক সময় সে দেশে আমার চুক্তির মেয়াদ শেষ হলো। সকলের সঙ্গেই বিদায়ী সাক্ষাৎ সমাপ্ত। মালপত্র বাধাবাধিও শেষ। রাত পোহালেই এয়ারপোর্টে যাবো। এমনি এক মুহূর্তে রাত সাড়ে এগারোটায় আমার বাসার কড়া নড়ে উঠলো। দরজা খুলতেই দেখি প্রতিবেশী উপরাষ্ট্রপতির ষোড়শী কন্যা আমার দরজায় দাড়ানো। তার হাতে রাংতায় মোড়ানো উপহার সামগ্রী। জানালো, আমার বড় ছেলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

আমি যথাসম্মানে তাকে বসতে দিয়ে আমার বড় ছেলে অন্তুকে ডাকলাম।

কিন্তু না। সে অন্তুর কাছে আসেনি। এসেছে আমার কাজের ছেলে আবুলের কাছে। ইতিমধ্যেই পরিপাটি হওয়া আবুল এগিয়ে আসতেই মেয়েটি তাকে জড়িয়ে ধরলো, কাদলো, ভালোবাসার কথা বললো, উপহার দিল। পরিশেষে বিদায় চুমু দিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আমি দ্বিতীয়বারের মতো ভাষা হারালাম। বুঝলাম আবুলকে আমার ছেলে ভেবেছে সেই মেয়ে।

কিন্তু এখনো জানলাম না অক্ষর জ্ঞানহীন আবুল কোন ভাষায় কথা বলে সে মেয়ের হৃদয় হরণ করেছিল?

*মালয়শিয়া থেকে*
islammn@yahoo.com

# খ

– ফাহিম রেজা পিয়াল

কলেজের অ্যানুয়াল ফাংশন চলছে। মঞ্চে কে একজন বক্তৃতা দিচ্ছে। বক্তৃতার পরেই আমাদের নাটক। মঞ্চের পাশেই পর্দা দিয়ে একটা জায়গা করা হয়েছে। পর্যাপ্ত আলোর অভাব। এরই মাঝে আর্টিস্টদের শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা। কেউ পোশাক বদলাচ্ছে, কেউ মেকআপ নিচ্ছে, কেউ ডায়ালগ আওড়াচ্ছে।

আমার ছোট চরিত্র। বাবা সাজতে হবে। ডায়ালগ গুলিয়ে ফেলি নাকি এই টেনশনে আমার ত্রাহি অবস্থা। জীবনের প্রথম নাটক, তাও আবার ইংরেজিতে!

পাতলা করে অপরিচিত একটা মেয়ে এগিয়ে এলো মেকআপ দিতে। আমি সুবোধ বালকের মতো বসে পড়লাম। মেয়েটি ব্রাশ, পেন্সিল দিয়ে দ্রুত কিন্তু মনোযোগের সঙ্গে আমার ফেসের ওপর তার কাজ শুরু করে দিল। সে আমার এতো কাছে দাড়িয়ে আছে যে, চোখ তুলে তার দিকে তাকাতে অস্বস্তি লাগছিল। মাথায় তখনো আমার ডায়ালগ নিয়ে টেনশন। এরই ফাকে একবার তার চেহারার ওপর মুহূর্তের জন্য নজর পড়লো। আরে! এতো দেখছি বেশ সুন্দরী। মেয়েটির মুখ আমার মুখের বিপজ্জনক নিকটে। কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই। খুব মনোযোগের সঙ্গে সে তার কাজ করে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে সে আমার এতো কাছে চলে আসছিল যে, তার চিবুকে যে হালকা ঘামের বিন্দু জমেছে তাও আমার নজরে এসেছিল।

এখানকার (নর্থ ইনডিয়ান) মেয়েদের স্কিনই অন্য রকম। রাগ লাগে, বাংলাদেশি মেয়েরা এই ব্যাপারগুলো বোঝে না। তারা আছে, কে কতো বেশি গহনা পরতে পারবে। তাদের যে সবচেয়ে অদ্ভুত দেখায় যখন বিয়েবাড়ি যাবার জন্য সাজে এটা যদি তারা জানতো...।

সে খুব মনোযোগের সঙ্গে আমার চুলগুলো ঠিক করছিল। দাড়িয়ে আছে বলে তার পুরো চেহারা দেখতে পারছিলাম না। কিন্তু তার স্পর্শ পাচ্ছিলাম। নিঃশ্বাস পড়ছিল আমার কাধে। মাঝে মধ্যেই তার শরীর আমার শরীরের সঙ্গে লেগে যাচ্ছিল। বিশেষ করে তার কোমর আমার কাধকে স্পর্শ করছিল। অদ্ভুত এক শিহরণ! মাঝে মধ্যে এই স্পর্শের স্থায়িত্ব যেন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। তখন হচ্ছিল অদ্ভুত এক অনুভূতি। আচ্ছা সে কি এটা ফিল করছে না, নাকি এটা ইচ্ছাকৃত?

সে আমার এতো কাছে যে, মাঝে মধ্যে তার গায়ের গন্ধ খুব স্পর্শভাবে পাচ্ছিলাম। হালকা একটু মাদকতা। মেয়েদের শরীরের গন্ধ কি এ রকমই হয়, নাকি এটা কসমেটিকসের গন্ধ? তবে আমার খুব ভালো লাগছিল গন্ধটা।

আমার গোফ আকার জন্য সে যখন একটু নিচু হলো তখন তার পুরো চেহারাটাই আমার নজরে এলো।

আমি হতবাক, নির্বাক। এতো দেখছি গোপাল, আমার ক্লাসমেট। এই নাটকে মেয়ে সেজে একটা রোল করছে।

*ঢাকা থেকে*

pial44@yahoo.com

# কোনো একদিন

– কামরুল হাসান

মাত্র মাস দুয়েক হলো জয়েন করেছি ইরানে খোররাসাবাদ শহরের এই ছোট্ট হাসপাতালটিতে। আজ আকাশ জোড়া মেঘ। ঝির ঝিরে বৃষ্টি। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপাদাপি। আজ আমার ইভিনিং ডিউটি।

প্রকৃতির এই গোমড়া মুখ দেখে কিছুটা খুশি হয়েছিলাম। যাক, আজ রোগীদের বেশি উৎপাত থাকবে না। দুপুরটা পড়ে কাটিয়ে দিতে পারবো। ঘণ্টা খানেক আগে ড্রাইভার আমাকে আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট (OPD) বা ওপিডির দরজায় নামিয়ে দিয়ে গেছে। আয়েশ করে বসে পড়ছিলাম। মাঝে মধ্যে জানালার শার্সিতে চোখ যাচ্ছে। মেঘলা মলিন আকাশ। পাইন আর বার্চ গাছগুলো ঝড়ো হাওয়ায় মাতামাতি করছে। রুমের গরম পরিবেশে বেশ রিলাক্সড লাগছে। মনে মনে প্রকৃতিকে ধন্যবাদ দিলাম। ঘড়িতে সাড়ে তিনটা বাজে। এখনো কোনো রোগী আসেনি।

হঠাৎ দরজায় ঠোকা পড়াতে মুখ তুলে বললাম, ভেতরে আসুন।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো তিন তরুণী। মুহূর্তে হাসির রিনি ঝিনি তরঙ্গে সমস্ত নিস্তবতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

দেখেই বুঝতে পারলাম এরা সিরিয়াস রোগী নয়। হাতে কোনো কাজ নেই। তিন বান্ধবী মিলে দোকানপাটে ঘুরতে বের হয়েছিল। এবং তারই এক ফাকে ঘুরতে এসেছে হাসপাতালের ওপিডি-তে।

রোগী দেখে তার হাতে ব্যবস্থাপত্র ধরিয়ে দিলাম।

হাসির তরঙ্গে ঘরটি ভরে দিয়ে তিন বান্ধবী চলে গেল। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে মিনিট দশেক পর এক বান্ধবী ফিরে এলো। একেবারে একা। লাজুক ভঙ্গিতে চেয়ার টেনে বসলো।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, কি ব্যাপার, তুমি অসুস্থ, সে কথা তো আমাকে বলোনি? তরুণীর বয়স পচিশ। একহারা গড়ন। তবে অন্য দশজন ইরানি মেয়ের মতো দুধে-আলতা রঙ নয়। কিছুটা চাপা।

আমার প্রশ্ন শুনে মুখে হাসি টেনে বললো, আমার নাম শায়লা। বাচ্চাদের স্কুলে পড়াই। হ্যা, আগে আমার অসুখ ছিল না। তবে এখন আমি অসুস্থ। ডাক্তার, আমার হৃদকম্পন বেড়ে গেছে।

চিন্তিত হয়ে পালস, ব্লাড প্রেশার এবং হার্ট চেক করলাম। বললাম, না তো তেমন কিছু পেলাম না।

আমার নার্ভাসনেস দেখে শায়লা হেসে ফেললো।

কিছুই পেলে না! আমার হৃদকম্পন বেড়ে গেছে তোমার জন্য। ডাক্তার আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ঘটনার আকস্মিকতায় কতোক্ষণ বাকশক্তি হারিয়ে বসেছিলাম বলতে পারবো না। এক সময় চেয়ে দেখলাম শায়লা চলে গেছে। ভাবতে অবাক লাগছিল কতো স্মার্ট মেয়ে শায়লা। আমার জীবনে যে কথা আমি কখনো কাউকে বলতে পারিনি, মাত্র দশ মিনিটের পরিচয়ে শায়লা তা বলে ফেললো। অবশ্যই স্মার্ট। স্মার্ট তো নয়, সুপারস্মার্ট। এই সব সাতপাচ ভাবছি।

এর মধ্যে ইমারজেন্সি থেকে ব্রাদার নিয়াজি এসে বললো, ডাক্তার, তোমার একটা ফোন এসেছে।

খুবই অবাক হয়ে যেতে যেতে ভাবছিলাম এই শহরে আমি একেবারে নতুন, আনকোরা। আমার এমন কেউ পরিচিত নেই যে, আমাকে ফোন করবে।

ফোনের রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই ওপার থেকে ভেসে এলো সেই কণ্ঠস্বর।

আবার আমার হৃদকম্পনের পালা। বাইরে ঝিরঝিরে তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। এতো ঠাণ্ডার মাঝেও আমার কপাল ঘামে ভিজে গেছে। থ্রোট ব্লকড একেবারে।

আমার অবস্থা দেখে ব্রাদার নিয়াজি মিটিমিটি হাসছিল। চোখ টিপে জিজ্ঞাসা করলো – ডাক্তার, মেয়েটি কে?

*কানাডা থেকে*

hassanquamrul@yahoo.com

# প্রমিজিং বয়

– আনোয়ার সাদাত শিমুল

নীল মখমলের নরম সোফায় বসতে বসতে মনের ভেতর উসখুস লাগছিল। মনে হচ্ছিল যতো বসবো ততোই ভেতরে ডুবে যাবো। তাই খানিকটা পা গুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকি। দামি কার্পেটের ওপর আমার জুতোগুলো বেশ মলিন। কালি করানো উচিত ছিল। এসব ভাবতে ভাবতে পত্রিকার বিজ্ঞাপনে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিই। এয়ার কন্ডিশনড রুমের ঠাণ্ডা বাতাস আমার নাকে শিরশির করে লাগছে। বাইরে এপৃলের দমকা গরম।

আপনি কিছু খাবেন, চা-কফি?

আপন ভাবনায় ছেদ পড়ে মি. লোকমানের প্রশ্নে। লোকমান আমাকে এ ঘরে এনে বসিয়েছেন। তিনি মি. চৌধুরীর সেক্রেটারি। চৌধুরী আমার ইন্টারভিউ নেবেন।

থ্যাংকস। শুধু এক গ্লাস পানি হলেই চলবে।

লোকমান কিছুক্ষণের মাঝেই এক গ্লাস নিয়ে আসেন। এ জাতীয় বাসায় সাধারণত কাজের লোকরা পানি আনে। এ বাসার কাজে লোকজন সম্ভবত এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। পানিতে চুমুক দিয়ে প্রশ্ন করি – আচ্ছা, চৌধুরী কখন আসবেন?

স্যার একটু পরেই আসবেন। আরো ক্যান্ডিডেট আসে কি না দেখি। আপনি একটু ওয়েট করুন, প্লিজ! বলে লোকমান ফাইল হাতে পাশের রুমে চলে যান।

আমি আবার পত্রিকায় নজর দিই। গতকালের ডেইলি স্টার। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন। যার বাংলা অনুবাদ হবে অনেকটা এ রকম : *একজন বাংলাদেশি দীর্ঘ দিন পর দেশে ফিরেছেন। তার তিন সপ্তাহ ঢাকা অবস্থানকালীন একজন সহকারী প্রয়োজন। আগামীকাল সকাল এগারোটার মধ্যে সশরীরে যোগাযোগ করুন।*
দেয়ালে ঘড়ির দিকে তাকাই। পৌনে এগারোটা। এর মাঝে লোকমান আরো দুজনকে এনে পাশের সোফায় বসান। আমার টেনশন শুরু হয়।
মিনিট দশেক পর লোকমান আমাকে ডাক দেন। নিয়ে যান পাশের রুমে। পার্সোনাল স্টাডি রুমের মতো মাঝারি সাইজের রুম। টেবিলের দুই পাশে তিনটি চেয়ার। চশমা পরা গম্ভীর মুখে একজন বসে আছেন এক চেয়ারে, পাশেরটিতে সতেরো–আঠারো বছরের এক কিশোরী।
সিট ডাউন প্লিজ।
থ্যাংকস বলে অন্য পাশের চেয়ারটিতে মুখোমুখি বসলাম।
আমি জাহেদ চৌধুরী। সে আমার মেয়ে শামা চৌধুরী। আপনি? ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন।
আমি শিমুল। স্টুডেন্ট। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি।
সাবজেক্ট?
বিবিএ।
সেমিস্টার?
থার্ড লাস্ট সেমিস্টার। কনসেনট্রেশন ইন মার্কেটিং অ্যান্ড ফাইনান্স।
বাসা কোথায়?
মিরপুর।
ঢাকায় কে কে আছেন?
মা, বাবা, বোন সবাই।
ভদ্রলোক এবার চশমা খুলে কাচ মুছতে থাকেন। পর পর বেশ কয়টি প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমিও একটু দম নিই। কিন্তু মুখে দৃঢ়তার ভাব তুলে ধরার চেষ্টা করি।
আপনাদের নর্থ সাউথের পড়ালেখার মান কেমন? চৌধুরী আবার প্রশ্ন শুরু করেন।
জি, ভালোই।
আর ইউ স্যাটিসফাইড উইথ ইটস কোয়ালিটি অফ এডুকেশন?
ইয়েস। আমি জবাব দিই।
টিউশন ফি কি মিডল ক্লাসের জন্য এফোর্ডেবল?
আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভে না।
আচ্ছা, আপনাকে তুমি বললে প্রবলেম নেই তো?
আপনি আমাকে নিঃসংকোচে তুমি বলতে পারেন।
তুমি পত্রিকার বিজ্ঞাপনটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছো?
জি পড়েছি।
আগেই বলেছি, সে আমার মেয়ে। আমরা অস্ট্রেলিয়াতে থাকি। আমি ব্যবসার কাজে দুই তিন মাস পর পর দেশে আসি। সে অস্ট্রেলিয়া–য় 'ও' লেভেল দিল এবার। সেই অবসরে বাংলাদেশ আসা। তার মা আসেনি। কাজের চাপ বেশি থাকায় আমি এবার একে তেমন সময় দিতে পারবো না। এখানে আমার তেমন আর কেউ নেই। তাই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া। তুমি একে কেমন সময় দিতে পারবে?
আপনারা যেমন চাইবেন।

তোমার নিজের পড়ালেখা, ক্লাস?
আমার এখন সেমিস্টার গ্যাপ। নেক্সট সেমিস্টার শুরু হবে মে মাসের থার্ড উইকে। তাই সময়ের তেমন সমস্যা হবে না।
তোমার সিভি এনেছো।
হ্যা।
রেখে যাও। ফোন নাম্বার দিয়েছো?
জি দিয়েছি।
মা, তুমি কি কোনো প্রশ্ন করবে?
না বাবা। মেয়ে জবাব দেয়।
ঠিক আছে, তুমি এখন যেতে পারো।
থ্যাংক ইউ। বলে উঠে দাড়াই।
দরজা যখন পার হবো তখনি এক্সকিউজ মি, কিশোরীর ডাকে ফিরে তাকাই।
আমার নামটা কি বলতে পারবেন?
শামা। ত্বরিত জবাব দিই।
ফাইন। কিশোরী হাসে।
রুম থেকে বের হয়ে আসি। বাইরে ততোক্ষণে আরো আট–দশজন প্রার্থী অপেক্ষা করছে।
বাসায় ফিরে কাউকে কিছু বলিনি। আপন মনে অদ্ভুত এ অভিজ্ঞতার কথা ভাবতে থাকি। মনে পড়ে বছর দশেক আগের বিটিভিতে প্রচারিত সেলিম আল–দীনের লেখা ধারাবাহিক নাটক *ছায়া শিকারি*–র কথা, যেখানে এক কৃশ্চিয়ান মানসিক রোগী (শম্পা রেজা)–কে সঙ্গ দেয়ার চাকরি পায় নায়ক (শহীদুজ্জামান সেলিম)। আমি মোটামুটি নিশ্চিত চাকরিটা আমি পাবো না। আমার বয়স এখানে নেগেটিভ ফ্যাক্টর। জাহেদ চৌধুরী এতোটা বোকা নন যে, আমার মতো ছেলে–ছোকরাকে নিয়োগ দেবেন তার মেয়ের অ্যাসিসটান্ট হিসেবে!
দুদিন কোনো খবর না পেয়ে যখন নিশ্চিত যে আমি বাদ। ঠিক তার পরদিন ফোন এলো।
আমি জাহেদ চৌধুরী। শিমুলকে চাচ্ছিলাম, প্লিজ।
জি বলছি।
ইয়াং ম্যান, ইউ হ্যাভ বিন সিলেক্টেড।
আমি কি বলবো বুঝতে পারলাম না।
তুমি এখনি আমার বাসায় এসো।
আচ্ছা আসছি। সংক্ষেপে জবাব দিয়ে দ্রুত রওনা হই।
এবার মি. চৌধুরী আমাকে নিয়ে যান ড্রয়িংরুমে। বেশ ঘরোয়া পরিবেশে আলাপ করেন। কথা হয় পরবর্তী তিন সপ্তাহ সকাল এগারোটা থেকে বিকাল পাচটা পর্যন্ত শামাকে সময় দেয়া লাগবে। সে যেখানে যেতে চাইবে, নিয়ে যেতে হবে। ড্রাইভারসহ গাড়ি দেয়া হবে। বেতন প্রতিদিন চার ইউএস ডলার।
আমি রাজি হয়ে যাই। মোটামুটি পাচ হাজার টাকার মতো পাওয়া যাবে।
পরদিন থেকে আমার চাকরি শুরু হয়। প্রথম দিন শামা যেতে চায় আমার পছন্দের জায়গায়। খানিকটা ভেবে তাকে নিয়ে যাই বুড়িগঙ্গা দেখাতে। বিদেশে থাকলেও শামা ভালো বাংলা বলতে পারতো। অবশ্য আমাকে মাঝে মধ্যে শিমুলের বদলে *শাইমুল* ডাকতো। আমার মজাই লাগতো।

প্রথম দিনই শামার থেকে জেনেছি আমাকে সিলেক্ট করার কারণ। শামা আর তার বাবার প্ল্যান ছিল এ রকম : ইন্টারভিউর সময় শুধু শুরুতে শামার নাম বলা হবে। বাকি সময় তার নাম উচ্চারণও করা হবে না। শেষ দিকে প্রার্থীকে নাম জিজ্ঞাসা করবে শামা। সেদিন নাকি আমি ছাড়া কেউ শামার নাম বলতে পারেনি।

স্মৃতিশক্তি পরীক্ষায় পাস করায় আমাকে এপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়। শুনে অনেক হেসেছি। অদ্ভুত বাবা-মেয়ে।

এরপর প্রতিদিন শামার সঙ্গে আমার ঘুরে বেড়ানো। আহসান মঞ্জিল, লালবাগের কেল্লা, ছোট কাটরা, বড় কাটরা, হোসেনী দালান, জয়কালী মন্দির, ঢাকার অপূর্ব সব স্থাপত্য নিদর্শন শামাকে দেখাতাম। স্থানগুলোর বিশদ বিবরণও দিতে হতো। এ জন্য আমাকে রীতিমতো ঢাকার ইতিহাস যোগাড় করে পড়তে হয়েছে।

যেদিন সোনারগাও দেখতে গেলাম সেদিন তুমুল বৃষ্টি। কাচপুর বৃজ পার হওয়ার সময় শামার মায়াবী চোখ আমার বুকের ভেতর কম করে হলেও সাতটা ড্রামের বাড়ি দিয়েছে। বারো-চোদ্দ দিনে শামা আমাকে অনেক আপন করে নেয়। আশুলিয়ায় নৌকায় উঠে কিংবা ফ্যান্টাসি কিংডমে রোলার কোস্টারে চড়তে আমার হাত যতোটা শক্ত করে সে ধরেছিল তাতে আমার হৃৎপিণ্ডে তিড়িং-বিড়িং এক নাচন উঠেছিল। নিজেকে সংযত করেছি বার বার আমার দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা ভেবে। হেলভেশিয়া, উইম্পি, বুমার্স, নীরব হোটেল কিংবা জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে চটপটি খেতে গিয়ে তার ঠোটের লেপ্টে যাওয়া লিপস্টিক টিসু পেপার দিয়ে আলতো করে মুছে দেয়ার সুপ্ত ইচ্ছাকে থামিয়েছি নিজের ভেতর অনেক সংগ্রাম করে। গাড়িতে পাশাপাশি বসলেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতাম সব সময়। এসবই ছিল আমার অন্তর্গত ব্যাপার। শামাকে বুঝতে দিইনি কখনো।

গিয়েছিলাম আমাদের ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে একদিন। ক্যান্টিনের সিঙাড়া খেয়ে সে বলেছিল, ইটস বেটার দ্যান ম্যাকডোনালডস বার্গার।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের ক্যাম্পাসের সামনে বাশিওয়ালার বাশি শুনে বিমোহিত শামা হাত ধরেছিল আমার। তখন আমার অনেক বন্ধুর ঈর্ষার চোখ আমার নজর এড়ায়নি।

একদিন বিকেলে শামাকে বাসায় পৌছাতে গিয়ে তার বাবার সঙ্গে দেখা হয়। জানলাম পরদিন তারা অস্ট্রেলিয়া চলে যাবেন। আমার জানি কেমন লেগে ওঠে।

আমার হাতে দুইশ ইউএস ডলার দিয়ে শামার বাবা বললেন - বাবা, এটা রাখো।

এতো অনেক বেশি। অবাক হয়ে বললাম।

হিসাবের বাইরেটা ভাবো। আমি তোমাকে খুশি হয়ে দিলাম। আফটার অল ইউ আর এ প্রমিজিং বয়।

সে রাতে বাসায় ফিরে কিছু খাইনি। খুব অস্থির লাগছিল। মাঝ রাতে বাথরুমে শাওয়ার ছেড়ে দাড়িয়েছিলাম ঘণ্টা খানেক। অস্থিরতা কমাতে সকালবেলা ডলারের নোট দুটাকে আগুনে পুড়িয়েছি। বার বার ভেবেছি, শামার প্রতি আমার এ ভালোলাগাকে কি ভালোবাসা বা প্রেম বলা যায়?

পরদিন বিকাল পাচটায় শামাদের ফ্লাইট। এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম বিদায় দিতে।

শামার বাবা বলেছিলেন, গুড লাক, প্রমিজিং বয়।

শামা কেবল চোখে চোখ রেখে বলেছিল, ভালো থেকো।

এয়ারপোর্টের বাইরে দাড়িয়ে ছিলাম। পাচটার সময় যখন একটা বিমান আকাশে উড়াল দেয় তখন আকাশে তাকাতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি। আমার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এসেছিল। ঝাপসা চোখ নিয়ে যখন বাসায় ফিরছি, এয়ারপোর্ট রোডের দুই পাশের সারি সারি রেইন ট্রিগুলোকে খুব আপন মনে হচ্ছিল। ওরা এতো কাছাকাছি থেকেও আসলে আমারই মতো একলা।

*নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, ঢাকা থেকে*
shimul2441139@yahoo.com

# ছবি

– এস.এম মোবিন

প্রতিদিনের মতো ঘুম খেতে উঠে ফ্রেশ হয়ে খাওয়া–দাওয়া সেরে অফিসের পথে রওনা দিলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর হঠাৎ মনে হলো রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি। একটু একটু করে মনে করতে চেষ্টা করলাম এবং মনে হলো পুরো স্বপ্নটা।

বাবাকে হারিয়েছি যখন আমার বয়স চার পাচ মাস। বাবা কাকে বলে তা বোঝার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। কিছু বড় হওয়ার পর সমবয়সীরা যখন বাবা বাবা বলে ডাকে তখন মাকে জিজ্ঞাসা করতাম, আমার বাবা নেই কেন?

মা কিছু না বলে শুধু বুকে জড়িয়ে ধরে কাদতেন।

যখন বুঝতে শিখেছি তখন জানতে পারলাম আমার বাবা ঢাকায় রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। বাবার অনুপস্থিতি প্রথম প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল একদিন কিশোরগঞ্জ বেড়াতে গেলে। সেখানে এক ভদ্রলোককে দেখলাম তার মেয়েকে খুব আদর করছে এমন দৃশ্য দেখে।

আমি এক মনে দেখতে থাকলাম আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, ইস! আমার জীবনে এমন যদি কেউ থাকতেন তাহলে আমাকেও এভাবে আদর করতো। ঠিক তখন থেকে মাথায় এই চিন্তাটা যেন বাসা বেধে বসলো। বাবার বয়সের কাউকে দেখলে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি এবং মনে মনে ভাবি, আমার জীবনে কেন এমন হলো! বাবার আদর আবার চাচাদের কাছেও কিছু পাওয়া যায়। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! বাবা মারা যাওয়ার এক বছরের মধ্যে দুই চাচাও মারা গেলেন। তাই আমার জীবন শুধু শূন্যতাই ভরে রইলো।

হ্যা যা বলছিলাম। বাবার কথা ভাবতাম আর মনে করতাম, বাবা যদি মরে না গিয়ে কোথায় হারিয়ে যেতেন এবং এখন আসতেন তাহলে কতোই না মজা হতো! সিনেমা বা নাটকে কতো দেখেছি, এভাবে হারিয়ে গিয়ে পরে আবার ফিরে আসতে। বাবা নেই এ কথা শুনে এক ভদ্রলোক বললেন বাবা নেই কি হয়েছে, বাবার বয়সের লোকদের শ্রদ্ধা করো, বাবার আত্মা শান্তি পাবে।

আমি এখন তাই করি।

ওই রাতে যখন স্বপ্নে দেখলাম বাবা চলে এসেছেন আমাদের মাঝে তখন তো আনন্দে আত্মহারা হয়ে মাকে বলছি, মা, আমি বলেছিলাম না, বাবা ফিরে আসবে। এই দেখো বাবা ঠিকই ফিরে এসেছেন। বাবা চেয়ারে বসে মিষ্টি মিষ্টি করে হাসছে। যখন স্বপ্নে দেখেছি তখন এমনভাবে দেখছি যেন এটাই বাস্তব। সকালবেলা যখন বুঝলাম আসলে আমি সব কিছু স্বপ্নে দেখেছি ঠিক তখন আর চোখে পানি ধরে রাখতে পারলাম না। দুই চোখ পানিতে ছল ছল করছে। কিন্তু কাদতে পারলাম না। সারাটা দিন মনে মনে অনেক কান্না করেছি। কিন্তু চোখ দিয়ে পানি পড়তে দিইনি।

অফিসের সবাই শুধু আমার অন্ধকার মুখটাই দেখেছে, ভাঙা হৃদয়টা দেখাইনি। মনের দুঃখ মনে রেখেই চাপা কান্নায় আমার সারাটা দিন কাটিয়েছি।

বাবার বংশে থাকার মধ্যে এখন শুধু বেচে আছে আমার একমাত্র ফুপু যিনি চট্টগ্রামে বাড়ি করে ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকেন। ছোটবেলা বেড়াতে গিয়েছিলাম সেখানে। ফুপু অ্যালবাম দেখাতে গিয়ে একটা ছবি আমার হাতে দিয়ে বললেন, দেখ তো এটা কার ছবি?

আমি চিনি না বলে ছবিটার কোনো গুরুত্ব না দিয়ে রেখে দিলাম এবং বাকি ছবিগুলো মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলাম। তখন ছবিটা আবার আমার হাতে তুলে দিয়ে ফুপু বললেন, এটা তোর বাবার ছবি। বলে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আমিও ঠিক থাকতে পারলাম না। তখনো আমি বাবা দেখতে কেমন ছিলেন, কার মতো ছিলেন তা কিছুই জানতাম না। এখন বাবা বলতে আমি সেই ছবিটাকেই বুঝি। তাই সেই ছবিটা কমপিউটারে স্ক্যান করে রেখেছি। যখন মনে হয় তখন সেই ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখি আর ভাবি, আমার জীবনটা কেমন। শুধু মা এবং একমাত্র বড় ভাইয়ের আদর ছাড়া যে, আমার কেউ নেই এই পৃথিবীতে আদর করার, একটু মাথায় হাত বোলানোর। এই দুঃখ আমি কাকে বলবো, এই দুঃখ আমার কে শুনবে। এ কেমন জীবন আমার! এই কথা লিখতে লিখতে এখনো কেদে ফেললাম।

*নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা থেকে*

# নানি

– মোহাম্মদ জহুরুল ইসলাম

প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন বিএডিসি-র স্টাফ ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, মধুপুরে চাকরি করি। সেখানে অফিসারদের মধ্যে অনেকেই সপরিবারে থাকতেন। দুই তিনজন ব্যাচেলর অফিসারও ছিলেন। বাসা খালি থাকায় আমার নামেও বাসা বরাদ্দ করা হলো। আমিও বাসায় উঠে গেলাম। সে সময় বাসা-বাড়ি ছিল ফৃ। মেসে না খেয়ে একাই স্বাধীনভাবে খাওয়া-দাওয়ার কথা ভাবলাম। কিন্তু রান্না করে দেবে কে? ইন্সটিটিউটের পাম্প ড্রাইভার খোকা। সে ছিল একজন স্থানীয় ছেলে, বেশ ভদ্র ও অনুগত। তাকে ডেকে বললাম, খোকা, আমি একাই খাওয়া-দাওয়া করতে চাচ্ছি। একজন কাজের ছেলে বা মেয়ে যোগাড় করে দাও।

খোকা বললো, জি আচ্ছা।

দুই দিন পরেই দেখি একজন বয়স্কা মহিলা নিয়ে আমার বাসায় সে হাজির। মহিলাটির বয়স ষাটের কাছে, তার অধিকাংশ দাতই পড়ে গেছে।

তুমি তো খুব বেশি বয়সের মহিলা এনেছো। সে কি সময় মতো রান্না-বান্না করে খাওয়াতে পারবে? বললাম আমি।

পারবে স্যার। বুড়ি হলে কি হবে, কাজ-কামে শক্তই আছে।

খোকা অনুনয়ের স্বরে আবার বললো, স্যার, তিনি সম্পর্কে আমার নানি হন। তিন কুলে তার কেউ নেই। সতীনের ছেলেরা বিয়ে করে যার যার মনে ভিন্ন সংসার করেছে। বুড়িকে কেউ ভাত দেয় না। স্যার, তিনি খুব অসহায়।

আমাদের সমাজে এ রকম অনেক অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছে যাদের দেখার কেউ থাকে না। ছেলেমেয়েরা যার যার মতো সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই বৃদ্ধ বয়সে তাদের সঙ্গ দেয়ার কেউ থাকে না, এমনকি তার প্রিয়জনের এতোটুকুও পরশও পায় না।

বৃদ্ধার এই অসহায়ত্বের কথা ভেবে মনটা খুব নরম হলো। বললাম, নানি, তুমি কাল সকাল থেকে এসো।

পরের দিন সকাল থেকেই নানি কাজ ধরলেন। তখন অফিস ছিল সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত। নানির বাড়ি ছিল অল্প দূরে। সকাল ছয়টার মধ্যেই বাড়ি থেকে এসে আমাকে ডেকে তুলতেন। সাড়ে সাতটার মধ্যে নাশতা তৈরি করে খাওয়াতেন এবং দুপুর দুটার মধ্যেই ভাত-তরকারি রান্না করে আমার অফিস থেকে আসার অপেক্ষায় বারান্দায় বসে থাকতেন। দেরি হলে আরো একটু এগিয়ে রাস্তার ধারে আমার জন্য পথ পানে চেয়ে থাকতো।

নানির রান্না-বান্না তেমন ভালো হতো না। তবুও সেটা আমার কাছে তেমন মুখ্য ছিল না। তার স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা দিন দিন আমাকে যেন দুর্বল করে তুললো।

বৃদ্ধার কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। সতীনের ছেলেমেয়েদের স্নেহ–মমতা দিয়ে বড় করলেও বিয়ের পর যার যার সংসার নিয়ে আলাদা হওয়ায় বৃদ্ধা সত্যিই সবার ভালোবাসা এবং আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছেন। তার দুইবেলা খাওয়া এবং তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাবোধ ইতিমধ্যেই তাকে আমার প্রতি স্নেহময়ী ও মমতাময়ী করে তুলেছে।

কোনোদিন আমাকে না খাইয়ে তিনি নিজে খেতেন না, তা যতো দেরিই হোক না কেন। দুপুরে রান্না–বান্না করে বারান্দায় বা রাস্তায় দাড়িয়ে আমার পথ চেয়ে থাকতেন। অফিসের কাউকে দেখলেই বলতেন, আমার নাতি এলো না?

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নানি হিসেবে কলোনির সবার কাছে তিনি পরিচত হয়ে গেলেন। ছোট–বড় সবাই তাকে নানি ডাকতো।

একদিন ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য কয়েকজন অফিসার অফিস থেকে ফেরার পথে অফিসের রাস্তায় নানিকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, নানি, এখানে দাড়িয়ে আছো কেন?

আমার নাতি কোথায়?

তোমার নাতির আসতে কিছু দেরি হবে। তুমি খেয়ে–দেয়ে বাড়ি চলে যাও।

ঘরের মরদ না খেলে মেয়েমানুষ কি আগে খেতে পারে?

নানির এ রকম কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। এরপর থেকে নানিকে ঠাট্টা করে কেউ বা বলতেন, জহুরুল সাহেবের ডার্লিং আবার কেউ বা বলতেন, দ্বিতীয় পক্ষ। নানি এসব কথায় কোনো উত্তর দিতেন না। হয়তো বা তিনি বুঝতেন না শুধু ফোকলা দাত বের করে মিটি মিটি হাসতেন।

নানির আরো একটা ডিউটি ছিল। আমি নাশতা করে অফিসে যাওয়ার পর তিনি সব বাসায় অন্তত একবার করে হলেও ভিজিট করতেন এবং সব বাসার হালহকিকত সংগ্রহ করতেন। আমি দুপুরে খেয়ে যখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে পেপার পড়তাম অথবা ঘুমের চেষ্টা করতাম তখন নানি এসে মেঝেতে আরাম করে বসে দুনিয়ার ফিরিস্তি টানতেন। অর্থাৎ কোন বাড়িতে আজ স্বামী–বৌয়ের ঝগড়া হয়েছে, কার বাসায় তরকারিতে লবন বেশি হয়েছে ইত্যাদি।

এসব শুনে আমার কান ঝালাপালা করতো। অনেক সময় ধমক দিয়ে বলতাম, নানি, এখন চুপ করো তো?

নানি আমার ধমক খেয়ে কিছুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলা আরম্ভ করতো, অমুক বাসার কাজের মেয়েটার কি ঢঙ। ঠোটে রঙ দিয়ে সাজগোজ করে রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াবে – ছুড়ি মনে করে, বরেরা তাকে দেখেই হয়তো হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

একদিন তাকে বললাম, নানি, তোমার বিয়ে হয়েছিল কোন বছর?

যে বছর ওই পাড়ার লাল গাই–এর কালো বাছুর হয়েছিল।

তাতো বুঝলাম। কিন্তু সেটা কতো সাল ছিল?

যে বছর দেশে আকাল পড়েছিল, তার পরের বছর।

বুঝলাম, এ বিষয়ে তার সঙ্গে আলাপ করে লাভ নেই।

আরেকদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, নানি, তোমার নাকি সতীন ছিল?

হ্যা ছিল। আমার সতীনের ঘন ঘন ছাওয়াল হওয়ায় তার শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়ে। আমার সোয়ামি এই দেখে তাকে বললেন, তোমার তো শরীর আর চলে না, সংসার–টংসার আর দেখার পারো না, তয় আমি না হয়...।

একদিন তিনি আমাকে দেখে ফেলেন। আমাকে তার খুব পছন্দ হয়। বাবার কাছে তিনি প্রস্তাব পাঠান এবং অল্প দিনেই আমাকে ঘরে তোলেন।

নানা কেমন লোক ছিল নানি?

খুবই ভালা। এমন লোক দুই চার গেরামে পাওয়া যায় না। আমাকে তিনি কতো সোহাগ করতেন।

নানি আবেগে সব বলতে থাকেন।

কেমন আদর–সোহাগ করতো তোমাকে?

হাট থেকে আমার জন্য বাতাসা, খাজা আরো কতো কি আনতেন। এবং লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে খাওয়াতেন। তারপর মেলায় গিয়ে আমার জন্য চুড়ি, আলতা আরো কতো কি আনতেন এবং বলতেন, ছোটবৌ, তুমি একটু সাজো তো, তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগবে।

এসব কথা বলতে বলতে অনেক সময় নানির দুই গাল বেয়ে পানি ঝরতো।

সতীনের সঙ্গে তোমার কোনো ঝগড়াঝাটি হয়নি?

না হয়নি। সেও আমাকে আদর করতো। বলতো, আমার তো বয়স হয়ে গেছে। শরীরও ভালো নয়, এখন থেকে তুই জামাইকে আদর করবি।

একদিন দুপুরবেলা এসে নানি অভিমান করে বসলেন। বললেন – নাতি, এখন থেকে আর তোমার কাজ করতে পারুম না।

বললাম, কেন নানি? কি হয়েছে?

একটু দম ধরে নানি বললেন, আশপাশে বাসার সবার বৌ আছে, শুধু তোমার নেই।

একটু ধৈর্য ধরো নানি, কিছুদিনের মধ্যেই তোমার নাতবৌ আসবে।

আমাদের বিয়ের পর আমার স্ত্রী আঙ্গুর আমাকে বললো, আচ্ছা, তুমি খাওয়া–দাওয়া কোথায় করো?

উত্তরে বললাম, কেন? আমার নানি আছে।

নানি! অবাক হয়ে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললো, তুমি ওখানে নানি কোথায় পেলে? আমি নানির সম্বন্ধে তাকে সব খুলে বললাম।

শুনে সে তো হেসে কুটি কুটি।

প্রথমবার আঙ্গুরকে না নিয়ে যাওয়ায় নানি আবার জেদ ধরলেন, তুমি নাতবৌকে নিয়ে এসো।

বললাম, তখন তো তোমার চাকরি নট।

কিন্তু নানির একই কথা, নাতবৌ দেখবে।

মাস দুয়েক পরে আঙ্গুরকে মধুপুরে নিয়ে এলাম, নাতবৌ পেয়ে নানি মহাখুশি। নাতবৌকে কি খাওয়াবে আর কি রান্না করবে সেটা নিয়ে তিনি মহাব্যস্ত। এছাড়া পেটের মধ্যে দুনিয়ার কথা নাতবৌকে বলা চাই।

আঙ্গুর কয়েকদিন পর তাকে বললো, নানি তোমাকে এখন থেকে আর রান্না করতে হবে না, আমিই করবো।

আঙ্গুরের এই কথা শোনে নানির মনটা যেন ভার হয়ে গেল। আঙ্গুরকে আড়ালে ডেকে বললাম, নানিকে একেবারে বাদ দিও না, তাহলে তার মনটা খারাপ করবে। বরং তুমি তাকে সঙ্গে রাখো।

আঙ্গুর বললো, আচ্ছা ঠিক আছে।

দিনকয়েক পরে এখানকার একজন ব্যাচেলার অফিসার আমাদেরকে বললেন, আপনারা তো বাড়ি থেকে একজন কাজের মেয়ে পেয়েছেন, নানিকে না হয় আমাকে দেন।

নানির মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও তার কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

কিন্তু নানি ওখানে গেলেও প্রতিদিন কাজের ফাকে আমাদের বাসায় আসতেন এবং আঙ্গুরের সঙ্গে সারাক্ষণ গল্প করতেন। আঙ্গুর তাকে মাঝে মধ্যে এটা–ওটা খেতে দিতো। খাওয়া পেয়ে এবং আঙ্গুরের সঙ্গে গল্প করতে সে নাকি খুব আনন্দ পেতো।

আমাদের বিয়ের প্রথম বার্ষিকী। আঙ্গুরকে বললাম, কি করা যায়।

বেশি কিছু করার দরকার নেই। আমি বিকেলে চা-মিষ্টির ব্যবস্থা করবো। তুমি এখানকার ভাই এবং ভাবীদেরকে নিমন্ত্রণ দিও।

কিন্তু তোমার জন্য? আমি আমতা আমতা করে বললাম। এখনকার দিনের মতো তখন কোনো ভ্যালেনটাইনস ডে পালন করা হতো না। বিয়েবার্ষিকীকেই ভালোবাসা দিবস হিসেবে গণ্য করা হতো। আমাদের প্রথম বিয়েবার্ষিকী অর্থাৎ প্রথম ভালোবাসা বার্ষিকী। তাই তোমাকে একটা শাড়ি প্রেজেন্ট করতে চাচ্ছি।

আঙ্গুর বললো, এতো টাকা খরচ করে আমার জন্য এখন শাড়ি কেনার দরকার নেই। বরং অল্প টাকার মধ্যে নানির জন্য একটা শাড়ি নিয়ে এসো, ম্যারেজ ডে-তে সেটা নানিকে দিয়েই আমরা আনন্দ উপভোগ করবো।

আমাদের ম্যারেজ ডে-এর বিকেলে ভাই-ভাবী প্রায় সবাই এসেছেন। নানিকে নতুন শাড়ি পরিয়ে অনুষ্ঠানে হাজির করা হলো। সবাই হাত তালি দিয়ে নানিকে অভিনন্দন জানালো।

অনেকে বলতে লাগলেন, নানি, তুমি আসলেই জহুরুল সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষ। দেখো না, তোমাকে কতো সুন্দর শাড়ি দিয়েছে।

নানির ফোকলা দাতের হাসি ছাড়া আর কোনো উত্তর দিলেন না।

কিছুদিন পর এ চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরি নিয়ে চলে এলাম দিনাজপুরে। মধুপুর থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় সারাক্ষণ নানি আমাদের পাশে ছিলেন এবং ছল ছল চোখে আমাদেরকে দেখছিলেন। এক সময় নানি আমার কাছে এসে বললেন, তোমরা আবার কবে আসবে?

বুঝলাম, নানি হয়তো এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, আমরা এখান থেকে একেবারে চলে যাচ্ছি। তাই নানির মনে আর দুঃখ না বাড়িয়ে বললাম, সময় সুযোগ পেলেই এখানে চলে আসবো।

আমার কথায় কতোটুকু তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন জানি না। তবে লক্ষ্য করলাম তার গাল বেয়ে দুই এক ফোটা পানি পড়ছে।

অনেক দিন পরে কোনো এক কাজে মধুপুরে গিয়েছিলাম। কিন্তু নানিকে আর পাইনি। নানি চলে গেছেন অনেক দূরে যেখান থেকে তাকে আর কেউ ফিরিরে আনতে পারবে না। মধুপুরে আসার সময় কতো কথাই না ভাবছিলাম। আমার আসার কথা শুনে নিশ্চয়ই নানি দৌড়ে আসবেন, কতো প্রশ্নই না করবেন। নাতবৌ কেমন আছে। আমাদের একটা মেয়ে হয়েছে। হয়তো বলবেন, মেয়েটা কার মতো হয়েছে।

নানি মারা গেছেন শুনতেই হৃদয়টা মোচড় দিয়ে উঠলো। তিনি আমার কোনো আত্মীয় নন, রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ কতো নিঃস্বার্থভাবেই না আমাদের তিনি ভালোবেসেছেন। সে কথা মনে হতেই নিজের অজান্তে আমার চোখ ভরে পানি এসে গেল। মধুপুরের সেই স্টাফ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের পরিবেশটা সেদিন বিষণ্ন লাগছিল।

আমার এ অবসর জীবনে মাঝে মধ্যে নানির কথা মনে পড়ে। পল্লির একজন অসহায় বৃদ্ধ মহিলা নিঃস্বার্থভাবে সে তার যে স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা দিয়েছিলেন তা লক্ষ-কোটি টাকা দিয়েও পাওয়া যাবে না!

*বগুড়া থেকে*

## ফসল

– হাসিনা তারিক

আজ থেকে পাচ বছর আগে আমার বিয়ে হয়। স্বামী একজন সামরিক কর্মকর্তা হওয়ার সুবাদে এই পাচ বছরে ঘুরে-ফিরে তার পোস্টিং হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম সব ক্যাম্পে। সেখানে পরিবার নিয়ে থাকার অনুমতি নেই। এই পাচ বছর আমি তার কাছ থেকে দূরে থেকেছি।

আমার বান্ধবীরা যখন নিজেদের সংসার গোছাতে ব্যস্ত তখন নীরবে চোখের জল ফেলতাম আর ভাবতাম কবে আমার নিজের সংসার হবে। কি যে কষ্টের ছিল সেদিনগুলো লিখে বোঝানো যাবে না।

মনে পড়ছে গত বছরের ভ্যালেনটাইনস ডে-র কথা। আমি তখন বরিশালে। আমার স্বামী যথানিয়মে ক্যাম্পে। হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিলাম এবার ভালোবাসা দিবসে আমি তার কাছে থাকবো। তাকে চিঠি লিখে জানালাম আমার ইচ্ছার কথা।

সে বললো, তাদের কমান্ডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলে তবেই আমাকে জানাবে।

অপেক্ষার প্রহর গুণতে লাগলাম।

অবশেষে আমাকে অবাক করে দিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে আমার স্বামী এসে আমাকে তার কর্মস্থলে নিয়ে গেল।

ক্যাম্পের কোলাহলমুক্ত পরিবেশ, চাদনি রাত আর লেকে তার সঙ্গে স্পিডবোটে ঘুরে বেড়ানো, সব মিলিয়ে গত বছর ভালোবাসা দিবস ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত।

যাহোক, অনেক প্রতিকূলতা কাটিয়ে এখন আমরা এক সঙ্গে থাকছি। আমাদের একটা ছোট্ট সংসার হয়েছে। এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি প্রথমবারের মতো মা হতে চলেছি।

আমার স্বামী প্রতিদিন সকালে অফিসে যাওয়ার সময় যখন আমার পেটে কান লাগিয়ে আমাদের অনাগত সন্তানের হার্ট সাউন্ড শোনে তখন নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ বলে মনে হয়। আমার গাইনোকলজিস্ট আমাদের সন্তান প্রসবের তারিখ নির্ধারণ করেছেন ১২ ফেব্রুয়ারি। মাত্র একদিন পর ১৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভালোবাসা দিবস। আমার স্বামী এবং আমার একান্ত ইচ্ছা আমাদের সন্তান যেন ১৪ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করে। ভালোবাসা দিবসেই পেতে চাই আমাদের ভালোবাসার ফসল। আল্লাহর কাছে সেই প্রার্থনাই করছি।

*চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে*

# তারিখ

– এস.এম শিমুল চৌধুরী

অপেক্ষা করতে করতে যখনই খুব অধৈর্য অবস্থা তখন দেখি আলো আসছে। রিকশা কাছাকাছি আসতে দেখি খুবই উৎকণ্ঠিত চেহারা। কিছুটা মিইয়ে গেলাম, ভ্যালেনটাইনস ডে-র স্ফূর্তিটা উবে যেতে শুরু করলো মন থেকে। আলো খুবই সাধারণ একটা সুতির শাড়ি পরেছে। কোনো মেকআপ তো দূরের কথা, লিপস্টিক পর্যন্ত নেই। V-ডের এই পোশাক! এই শাড়িটা আমার মনে হয় সে বাসায় পরে।

এতো দেরি যে?

আর বলো না। আলো রিকশা ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বললো, ছোট ভাইটার ডায়ারিয়া শুরু হয়েছে। কাল রাত তখন একটা দেড়টা হবে, এমন সময়...।

থাক, থাক, তোমার ডায়ারিয়ার গল্প থাক। আমি তাকে থামিয়ে দিই। এখন বলো, কোথায় যাবে?

ওমা! আমি বলবো কি। আমি ঢাকা শহরের কিছু চিনি! চলো কোনো পার্ক-টার্কে ঘুরি।

আমি যেভাবে আজকের দিনটি কাটানোর ছক করেছিলাম, শুরুটা ওভাবে হলো না। সে এলোই এতো দেরি করে! মনটা খারাপ হয়ে গেল।

আর পার্ক-টার্কে ঘোরার কি সময় আছে নাকি। এখন তো লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। চলো কোনো চায়নিজে যাই।

না, না, আলো চলতে চলতে থেমে গেল। আমি চায়নিজে যাবো না।

কেন, কেন?

আমি কাটা চামচ দিয়ে খেতে পারি না।

এ জন্যই আমার আলোকে এতো ভালো লাগে। কি সরল-সোজা অকপট স্বীকারোক্তি। অন্য কেউ হলে হয়তো বলতো, চায়নিজ খেতে খেতে ফেড আপ হয়ে গেছি। আজ চায়নিজ নয়।

তারচেয়ে চলো কোনো ছবি দেখি। আলো প্রস্তাব করলো। কোনো বাংলা ছবি দেখি চলো। অনেক দিন বাংলা ছবি দেখি না। রিয়াজ নামে এক নতুন হিরো নাকি এসেছে, খুব সুদর্শন দেখতে। তার একটা ছবি দেখি চলো।

বুঝেছি। এই মেয়েকে শেখাতে টাইম লাগবে। আজকালকার দিনে এ রকম মেয়েদের পদে পদে বিপদ। ঠিক ছেলের পাল্লায় পড়লে বারোটা বাজাবে।

ছবি তখন শুরু হয়ে গেছে। পর্দায় বিশাল স্বাস্থ্যবতী একটা হিরোইন নেচে-গেয়ে রিয়াজের সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করছে।

ও! তোমার জন্য একটা গিফট দিতে হয়।

একটা রুমাল। প্রেমিককে রুমাল দিলে যে সম্পর্ক টেকে না এই কথাটা তাকে কেউ বলে দেয়নি। তবে এ জায়গায় সে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। V-ডের প্রোগ্রাম সেটিং, তাকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে আসাটা ম্যানেজ করা, অফিস থেকে ছুটি নেয়া ইত্যাদি কাজে এমন ব্যস্ত ছিলাম যে, তার জন্য কোনো উপহার বা কার্ড কেনার কথা বেমালুম ভুলে গেছি।

মনে মনে খুবই অনুশোচনা হতে লাগলো সে জন্য।

নায়িকাটার নাম কি জানো? আলো বললো, বেশ সুন্দর দেখতে, তাই না?

সুন্দর কোথায়? ধুমসি। ওভারওয়েট মেয়েরা যতোই সুন্দরী হোক, আমার কাছে ভালো লাগে না। আমি সরল মনেই কথাটা বললাম তাকে।

অন্ধকারে রিয়ার হাতের ওপর হাত রাখলাম। তার হাত আড়ষ্ট। মুখ দেখে প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করলাম। সে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে অন্যদিকে। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম সে রীতিমতো কাদছে। অথচ পর্দায় তখন দিলদার না, কে তার একটা হাসির সিকোয়েন্স দেখাচ্ছে। আশপাশের সবাই হো হো করে হাসছে।

এই আলো, কি পাগলামো করছো? কাদছো কেন?

আমি যদি কোনোদিন এ রকম মোটা হয়ে যাই তাহলে তুমি আর আমাকে ভালোবাসবে না?

কিসের মধ্যে কি? মেয়েমানুষ নিয়ে তো বড় জ্বালা। কথাটা শুনেছি বটে আগে, এই প্রথম বিশ্বাস করলাম।

পকেট থেকে তার দেয়া রুমাল দিয়েই তার চোখ-টোখ মুছিয়ে শান্ত করা গেল।

আমি একটা গিফট দিলাম, তুমি ভালো করে তাকিয়েও দেখলে না। আলো অভিযোগ করলো।

এখন এই অন্ধকারে কি দেখবো? বাড়ি গিয়ে ভালো করে দেখবো। ফুল তুলে দিয়েছো তো! *যাও পাখি বল তারে...*

যাও, আমি ওসব ফুল টুল তুলতে পারি না।

বাইরে বেরিয়ে দেখি আরেক বিপত্তি। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি মাসের চোদ্দ তারিখে বৃষ্টি খোদার অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটা রিকশাও পাওয়া যাচ্ছে না। এমনিতে যখন রিকশার দরকার নেই, রিকশাচালকগুলো লাইন করে পায়ের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করবে, কই যাইবেন স্যার? আর যখন খুব প্রয়োজন তখন তার নিজেদের পছন্দমতো গন্তব্য না হলে যাবে না অথবা বদলির সময় হয়ে গেছে ইত্যাদি নানান অজুহাত।

বৃষ্টিটা একটু কমেছে। এর মধ্যেই রাস্তায় নেমে আমরা হাটতে শুরু করলাম। একটা ফাস্টফুড শপে গিয়ে ওঠা গেল। V-ডে বলে সেখানে বেজায় ভিড়। জোড়ায় জোড়ায় সব জায়গা দখল। আমরা আধভেজা অবস্থায় কিছু অর্ডার দিলাম। ক্ষিধেয় পেট চো চো করছে।

এর নাম বিফবার্গার? ঘাসের মতো লাগছে খেতে। এগুলো লোকে পয়সা দিয়ে কিনে খায়? আলোর চোখে বিস্ময়।

তুমি জানো, ঢাকা শহরে দুইশ টাকা দামের বার্গারও আছে?

শুনে আলোর চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

আশটে একটা গন্ধ আসছে না। কোথেকে বলো তো? আমি গলা নামিয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম।

সে চারপাশটা পরখ করে হাসলো। মনে হয় আমার গা থেকে। শাড়িতে মাড়টা একটু বেশি পড়ে গিয়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজে সর্বনাশ হয়ে গেছে। তোমার কি খুব অস্বস্তি লাগছে? চলো তাহলে চলে যাই।

এ রকম সরল-সোজা মেয়ে কম দেখেছি। আলোকে আজ আরো বেশি করে ভালোবাসলাম।

ছোট ভাইটার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে। স্যালাইন যা বানিয়ে রেখে এসেছি তা মনে হয় শেষ। মা আবার স্যালাইন বানাতে পারেন না। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

তাদের বাড়িতে আগেও কয়েকবার গেছি। পৌছে দেখি তার মা বারান্দায় পানির গামলা, লবণের বাটি ইত্যাদি নিয়ে বসে আছেন। আমাদের দেখে বলে উঠলেন, ভালো হয়েছে তোমরা চলে এসেছো। খোকনের স্যালাইন সব শেষ। এক্ষুণি না বানিয়ে খাওয়ালে মুশকিল হবে।

একটু পরে মা, আগে তার জন্য চা বানিয়ে আনি। বলে আলো ভেতরে চলে গেল।

বললাম, দিন, খালাম্মা আমি বানিয়ে দিচ্ছি।

ভ্যালেনটাইনস ডে-তে ভালোবাসার মানুষের ঘরের দাওয়ায় বসে আধা সের পানি, এক মুঠ গুড় আর এক চিমটি লবণ দিয়ে স্যালাইন বানাতে লাগলাম।

*মিরপুর, ঢাকা থেকে*

# ঝরা বকুল

– মোহাম্মদ নাজমুল হক

বকুল ছিল আমাদের বাড়িতে আশ্রিতা। বিশ বাইশ বছরের এই মেয়েটি প্রথম এ বাড়িতে আসে বছর দেড়েক আগে। তখন সে ছিল স্বামী পরিত্যক্তা এক নারী। আমার মা স্কুল শিক্ষিকা। বাবা সারাক্ষণ সমাজ সেবা ও রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

আমার বড় আপার বিয়ের পর বকুলকে এ বাড়িতে মা নিয়ে আসেন। সে মায়ের খুব বিশ্বস্ত ও অনুগত। গরিব ঘরে জন্ম নেয়া এই মেয়েটি আমাদের বাড়ির ভালো খাবার ও পরিবেশ পেয়ে ক্রমেই যেন বকুল ফুলের পাপড়ির মতো শত ধারায় বিকশিত হয়ে ওঠে।

আমার প্রতি তার ছিল বাড়তি নজর।

কিছুদিন ধরে বকুলকে এক রহস্যময়ী মানবী বলে মনে হয়। আজকাল বকুল একটু বেশি সাজগোজ করছে। অকারণে ঘন ঘন কাছে আসছে। মিষ্টি করে হাসছে এবং বৈশাখি দমকা হওয়ার মতো হৃদয়ে ঝড় তুলছে। তার ধারালো চাহনি আমার হৃদয় পুড়ে ভস্ম করে দেয়। এ যেন সাকির পেয়ালায় ভরা ধুতরা নির্যাস। পান করে উন্মাতাল হতে ইচ্ছা হয়।

এক নির্জন দুপুরে বকুলকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তুমি এতো সুন্দর, তবুও স্বামী তোমাকে তালাক দেন কেন?

মুহূর্তে তার চোখ জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। বললো, আমার সন্তান হয় না। আমি বাজা, এটা কি আমার দোষ? শয়তানটা (ওর স্বামী) আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।

তার পিঠের এবং উরুর একাংশ অনাবৃত করে আঘাত ও নির্যাতনের চিহ্ন দেখালো। তার সুন্দর ও মসৃণ উরু আমার রক্তে শিহরণ তোলে।

ঈদের সময় মা কিছু টাকা দিয়ে বললেন, সবার জন্য কাপড়-চোপড় কেনা হয়েছে, শুধু বকুল বাকি আছে। তার জন্য একটা শাড়ি কিনে আনিস।

পছন্দ করে শাড়ি, ব্লাউজ ও ব্রা কিনলাম। তাকে ব্রা দেখিয়ে বললাম, কেমন হয়েছে? তোমার সাইজের সঙ্গে মিলবে তো?

বকুল আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে চলে গেল।

ঈদের দিন শাড়ি পরে খুব সেজেগুজে বকুল আমার রুমে এসে বললো, দেখেন তো কেমন হয়েছে?

খুব সুন্দর। যেন নীল পরী। আমার খুব ইচ্ছা করছে আজ তোমাকে....।

বকুল কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, থামলেন কেন বলেন? আজ আপনার যা ইচ্ছা তা নিতে পারেন। আমার বাধা অগ্রাহ্য করে নেন। দস্যুর মতো কেড়ে নেন।

শরীরটা ভালো লাগছে না। তাই শুয়ে আছি। একটু পরে বকুল এসে পাশে বসলো। তার চোখ জোড়া যেন আটলান্টিক মহাসাগর। তার চোখের দিকে তাকালেই যেন বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে হারিয়ে যাই। বকুল আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে।

তার শরীরের উষ্ণতা আমি অনুভব করছি। নারীর শরীর কি মায়াবী গন্ধ, শিহর ও মাদকতায় পরিপূর্ণ।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। আমি লক্ষ্য করি, বকুলের চোখ জোড়া জলে ভেজা। জিজ্ঞাসা করি, বকুল, তোমার কি হয়েছে?

আমাকে একটা বাচ্চা দিতে পারবেন? আমি মা হতে চাই। তাহলে আমি হবো পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ।

বুঝলাম বকুল পরিপুর্ণ নারী হয়ে মাতৃত্বের গৌরবে মহিমান্বিত হতে চায়। আর তাহলেই বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ তার জীবন থেকে পালিয়ে যাবে।

আমি উচ্চ শিক্ষার জন্য ময়মনসিংহ এ.এম. কলেজে ভর্তি হই। একদিন বাড়ি গিয়ে জানলাম বকুলের বাবা-মা জোর করে তাকে অন্যত্র বিয়ে দিয়েছে।

তারপর অনেক দিন পেরিয়ে গেছে। আমি কর্ম জীবনে প্রবেশ করেছি।

একদিন গ্রামে গিয়ে খোজ নিয়ে জানলাম বকুলের দ্বিতীয় স্বামী তাকে ডিভোর্স দিয়েছে। সমস্যা একটাই, বকুলের সন্তান হয় না। যুগ যুগ ধরে গড়া বাংলার সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে মনটা ঘৃণায় ভরে গেল। পুরুষ শাসিত এ সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা নির্যাতিত। এক নারীর সন্তান হয় না বলেই কি এ সমাজে মানুষ হিসেবে তার বেচে থাকার কোনো অধিকার নেই?

*নেত্রকোনা থেকে*

## অজ্ঞতা

– মোহাম্মদ ফারুক আহমেদ

ভদ্রলোকের দুই বাচ্চাকে পড়াতাম বলে তার স্ত্রীকে বোন ও তাকে দুলাভাই ডাকতাম। একদিন বাসায় (তাদের) গিয়ে শুনি ভদ্রলোক হাসপাতালে ভর্তি। ছাত্রদেরকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, কি এক অসুবিধায় অবস্থা খারাপ হওয়ায় হাসপাতালে নেয়া হয়।

হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলে এবং সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, কয়েকদিন আগে তার পুরুষাঙ্গে একটা ফোড়ার মতো হয়। তার স্ত্রী ফ্রেশ ডেটল দিয়ে ক্ষত স্থান মুছে দিতে গেলে ক্ষত স্থানে প্রচণ্ড জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়। ফলে হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হন। পরে চিকিৎসক জানায় যে, ফ্রেশ ডেটল ব্যবহার করায় ক্ষত স্থান বার্ন হয়ে গিয়েছে এবং প্রস্রাবের নালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে অপারেশন জরুরি। প্রথম অপারেশন করে প্রস্রাবের নালী ঠিক করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে রোগীর ডায়াবেটিস জনিত জটিলতার প্রেক্ষিতে তার পুরুষাঙ্গের পুরোটাই কেটে ফেলে দিতে হয়।

স্বামীর প্রতি একজন স্ত্রীর ভালোবাসা ও সেবার মহৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও শুধু অজ্ঞতার জন্য উভয়ের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

আমার প্রিয় যায়াযদিন পত্রিকার মাধ্যমে সকল পাঠককে অনুরোধ করবো, ডেটল বা যে কোনো এন্টিসেপ্টিক পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করবেন এবং কখনো নরম মাংসপেশিতে ও বাচ্চাদের শরীরে ফ্রেশ এন্টিসেপ্টিক ব্যবহার করবেন না।

*মুন্সিপাড়া, সিলেট থেকে*

# ঐই সমাজ

– শামীমা

১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩। স্কুল বন্ধ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের কারণে। মিমকে গোসল করালাম। নিজে গোসল করলাম।

মিমকে তার সবচেয়ে প্রিয় লাল-হলুদ প্রিন্টের ফ্রকটা পরালাম। ছোট্ট লাল জুতাটা পরালাম। মাথার চুল আচড়ে দিলাম। ওর কপালে একটা লাল টিপ দিলাম।

হঠাৎ কলিং বেল বাজালো। তার চাচা বাসায় এসে হাজির। মিমকে নিতে এসেছেন। বুকের ভেতরটা কষ্টে মোচড় দিয়ে উঠলো। তিনি এসেই তাড়াহুড়ো শুরু করলেন তাকে রেডি করে দেয়ার জন্য।

মেয়েটাকে ভাত খাওয়াচ্ছি আর কাদছি।

আমাকে কাদতে দেখে মিম বললো, আম্মু, তুমি কাদছো কেন?

আমার কান্না তার ভালো লাগছে না বুঝতে পারলাম। তাই কান্না ভেজা চোখে হেসে উত্তর দিলাম, কই, কাদছি না তো?

খাওয়ার মাঝেই সে আমাকে বার বার বলতে থাকে, আম্মু, নানুকে বলো চাচ্চুর সঙ্গে আমি যাবো না। কাল নানাভাইয়ের সঙ্গে যাবো।

মিম চলে যাচ্ছে।

কোলে করে এগিয়ে গেলাম। কেমন ছোট হয়ে আছে মেয়েটার মুখটা। একটুও হাসি নেই। রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে তাকে কোল থেকে নামালাম।

কেন জানি চাচার কোলে উঠলো না।

শেষবারের মতো চুমু খেলাম, আদর করলাম।

বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

তার চাচা তার হাত ধরে সামনে এগিয়ে গেল।

আমার সন্তান আমার কোল খালি করে চলে যাচ্ছে।

পেছন থেকে আমি তাকিয়ে আছি।

আমার বুকটা খালি করে পাচ বছরের ছোট মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছেন তার দাবিদার চাচা। বাবা মারা গেলে চাচারাই নাকি দাবিদার হয়। মায়ের নাকি কোনো দাবি থাকে না সন্তানের ওপর। সেই দাবির অংশ হিসেবে মিমকে নিয়ে গেল তার দাদার বাড়ির লোকেরা!

আজ এক বছর হতে চললো। মেয়েটাকে তার দাদার বাড়ির লোকেরা আমার কাছে আসতে দেয় না। মিমকে আনতে গেলে অপমান করে মুখের ওপর বলে দিয়েছে, আর কখনো তাকে নিতে আসবেন না।

আমি এক পাষাণ মা। এক মায়ের ভালোবাসা আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কাবুলিওয়ালার মতো হয়ে গেছে যে কাবুলিয়াওয়ালা তার ছোট মেয়েটার হাতের ছাপ জামার পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো, ফেরি করতো কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়।

আর আমিও আমার মিমের ছবি ব্যাগে নিয়ে ঘুরি। তার জামা-জুতা পরিষ্কার করে রাখি। মিম যখন আসবে তখন এগুলো পরবে। তার অপটু হাতে লেখা অ, আ খাতা-কলম যত্ন করে রেখেছি। আমার কলিজা আসবে আবার আমার কাছে, আম্মু বলে ডাকবে। স্কুল থেকে ফেরার পর বলবে, আম্মু তোমার ব্যাগটা দেখি। কি এনেছো আমার জন্য?

স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে তার বয়সী মেয়ে দেখলে থমকে দাড়াই। মনে হয় আমার মিম। মা হয়ে আজ সন্তানকে আদর করতে পারি না, দাবি করতে পারি না। বুকের ভেতরটা কষ্টে কষ্টে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

এ কেমন সমাজ?

আমি কোন ধরনের *সভ্য* সমাজে বাস করছি?

*মসজিদ রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে*